সন্দেশ

ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

পৌষ ১৪০২

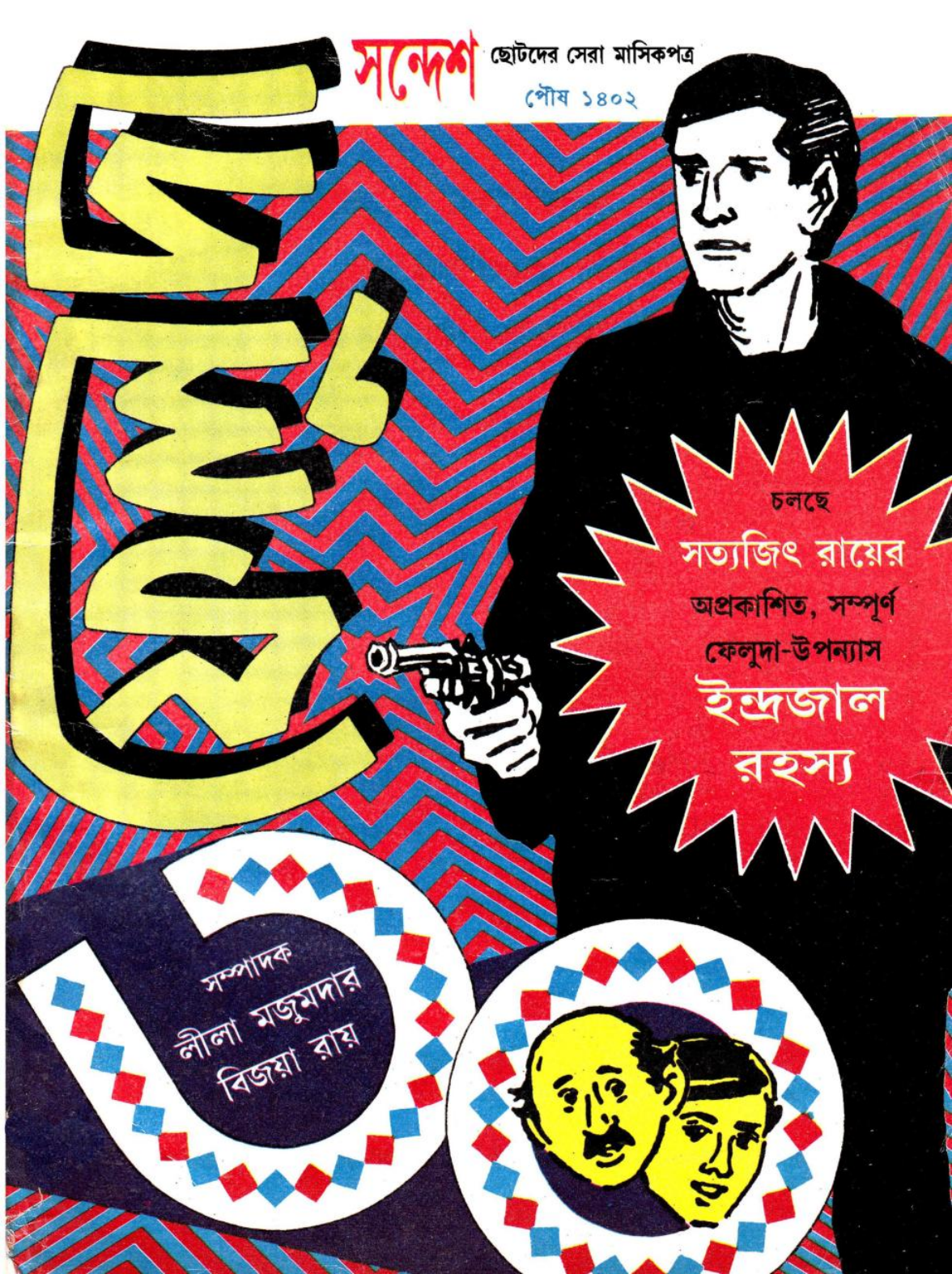

চলছে

সত্যজিৎ রায়ের

অপ্রকাশিত, সম্পূর্ণ

ফেলুদা-উপন্যাস

ইন্দ্রজাল

রহস্য

সম্পাদক

লীলা মজুমদার

বিজয়া রায়

ক্যাঙারু মায়েদের মতোই পিয়ারলেস হসপিটাল যত্ন নেয় মানব-শিশুদের।

ক্যাঙারু-মায়েদের বাচ্চা হয় খুব ছোট। যেন ওরা এক একটি ভ্রূণ। এই ভ্রূণ-শিশুরা লালিত হয় মায়ের পকেট-থলিতে। প্রাকৃতিক ইনকিউবেটরে। টানা ১৪ মাস। তারপর পুরোপুরি ছাড়পত্র পায় বাইরে বেরিয়ে আসার।

পিয়ারলেস হসপিটালে আছে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা-সম্বলিত প্রসূতি-বিভাগ ও শিশু-বিভাগ। এখানে পেডিয়াট্রিক বিভাগে রয়েছে অসময়ে জন্মানো গুরুতর অসুস্থ শিশুদের জন্য ১০টি **শয্যাবিশিষ্ট নিয়োনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট।** আরও আছে বিদেশী প্রযুক্তিতে নির্মিত ইনকিউবেটর। ঠিক যেন প্রকৃতি থেকে শিখে নেওয়া ক্যাঙারু-মায়েদের পকেট-থলি।

আছে বাড়তি অন্যান্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। সারভো-নিয়ন্ত্রিত ভেন্টিলেটর, রেডিয়্যান্ট ওয়ারমার, ফোটোথেরাপি ইউনিট, রিসাসিটেটর ইত্যাদি। সময়ের আগে জন্মানো মানব-শিশুদের পরিচর্যার জন্য।

যাবতীয় চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

পিয়ারলেস হসপিটাল অ্যান্ড বি. কে. রায় রিসার্চ সেন্টার

৩৬০, পঞ্চসায়র, গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪ **ফোনঃ** ৪৬২-০৯৫৫/২৩৯৪/৬৩৯৪/২৪৬২

ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা প্রগতির পথে পা বাড়াই

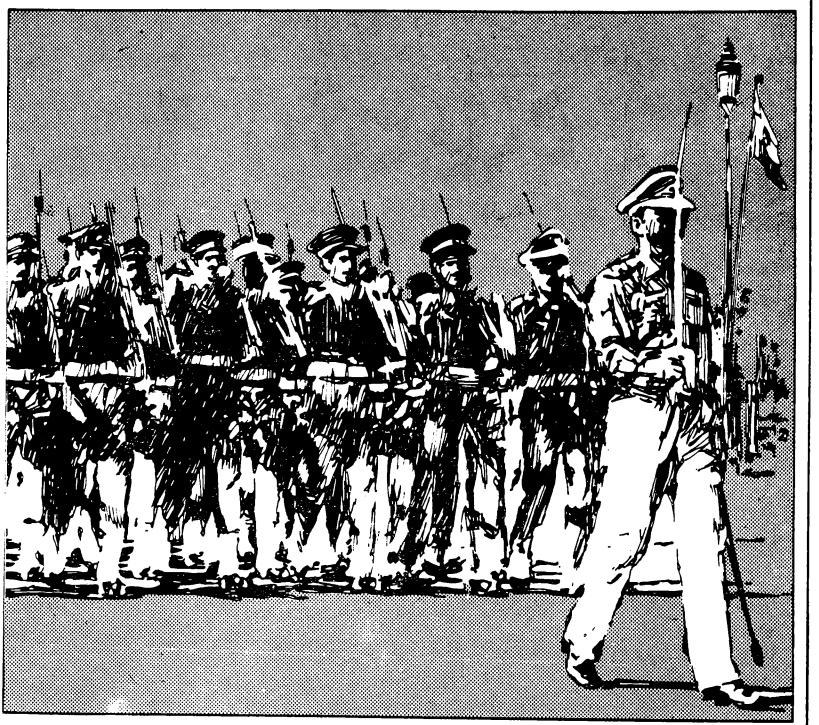

আমাদের চলা থামবে না

প্রজাতন্ত্র দিবস, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সন্দেশ

মাঘ ১৪০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। দাম ২০ টাকা
বিশেষ 'গোয়েন্দা গল্প' সংখ্যা

সত্যজিৎ রায়ের
গোয়েন্দা ফেলুদার ধারাবাহিক উপন্যাস
ইন্দ্রজাল রহস্য
ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শার্লক হোমস্-এর সম্পূর্ণ উপন্যাস
রুদ্ধ ঘরের রোমাঞ্চ
এই প্রথম অনূদিত হলো বাংলায়!
ছবি : সমীর দাস

সত্যজিৎ রায়ের
'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবি তৈরির
অপ্রকাশিত রঙিন খস্‌ড়া
খেরোর খাতা

আরও তিনটে ধারাবাহিক আকর্ষণ
সত্যজিৎ রায়ের
ফেলুদা ইলাসট্রেশন অ্যালবাম
সন্দীপ রায়ের
ফেলুদা ফোটো অ্যালবাম
সুজয় সোমের
ফেলুদার সঙ্গে আড্ডা

তাছাড়া
ছড়া-কবিতা, কমিক্‌স,
কার্টুন,
লুবিন খুড়ো

প্রচ্ছদ : সন্দীপ রায়

পাঁচটা দুর্দান্ত গোয়েন্দা গল্প
লীলা মজুমদার
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
অমিতানন্দ দাশ
দীপঙ্কর সরকার
নলিনী দাশ

সেইসঙ্গে
শার্লক হোমস্ টেলিভিশন-পোস্টার
ফেলুদা ক্যালেন্ডার

'ফেলুদা ৩০' বিষয়ে আরও লেখা

বিভাগীয় রচনা
গল্প-সল্প : সুজয় সোম
বই চেনো : উজ্জ্বল চক্রবর্তী
কুইজ : পর্ণব মুখোপাধ্যায়
খেলাধুলা : প্রসাদরঞ্জন রায়
চিঠিপত্র
পত্রবন্ধু হ'তে চাই
হাত পাকাবার আসর

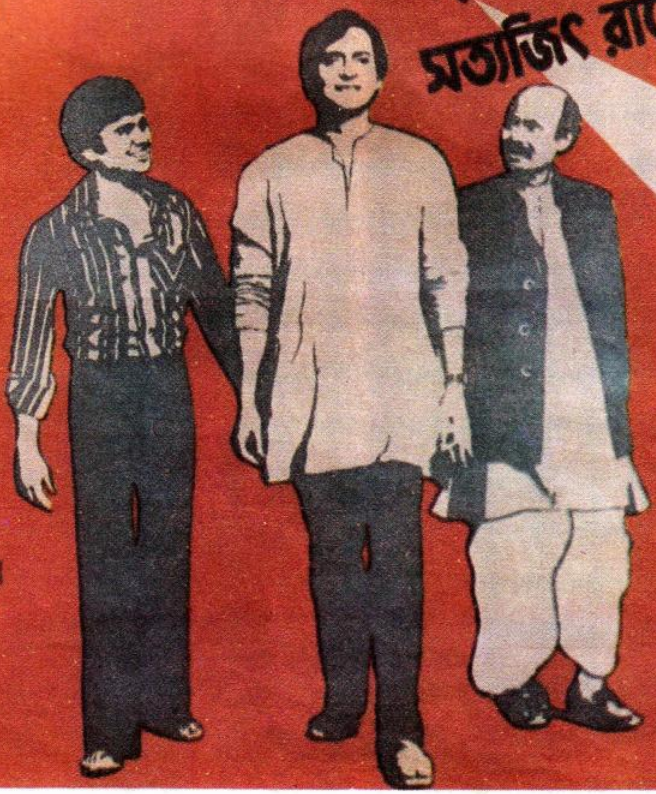

আর.ডি.বনশল
নিবেদিত
জয়বাবা ফেলুনাথ
সত্যজিৎ রায়ের ছবি!
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত • সন্তোষ দত্ত
সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি
হারাধন ব্যানার্জি
সত্য ব্যানার্জি
বিমল চ্যাটার্জি
বিপ্লব চ্যাটার্জি • মলয় রায়
মনু মুখার্জি • কামু মুখার্জি
ইন্দুভূষণ গুজরাল এবং
শ্রীমান জিৎ বোস

ইন্দ্রজাল রহস্য। সত্যজিৎ রায় ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জানুয়ারি ১৯৯৬

শীতবুড়ি

যতীন্দ্রমোহন মজুমদার

কুয়াশার পর্দাটা দূরে সরিয়ে
একমুঠো রাঙা রোদ দেয় ছড়িয়ে।
ভোরবেলা হাসিমুখে সূর্যঠাকুর
ইঙ্গিতে বলে, শীত নয় বেশি দূর।
মাঠে মাঠে সুকোমল সিক্ত ঘাসে
শিশিরের মুক্তোরা মিষ্টি হাসে।
উঠোনের এক ধারে মরসুমি ফুল
মোরগ, গাঁদা ও বেলি হেসেই আকুল।
হিমঢালা ঝিরিঝিরি উত্তুরী বায়
সুড়সুড়ি দিয়ে যায় সকলের গায়।
কাশ্মীরী আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে
শীতবুড়ি নেমে এলো ধড়মড়িয়ে।

সত্যজিৎ রায়

ইন্দ্রজাল রহস্য

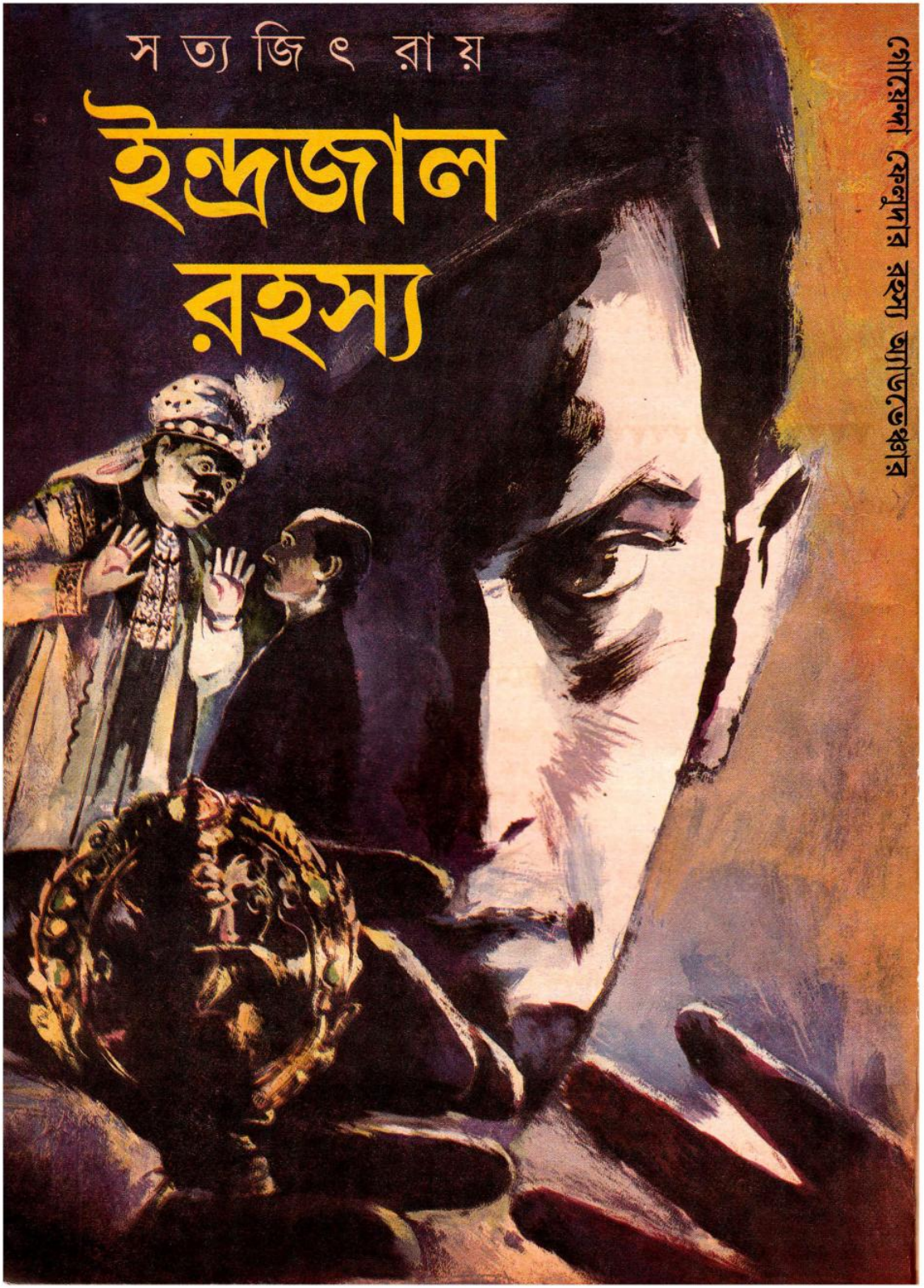

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

৩

পরদিন সোমেশ্বরবাবু টেলিফোনে জানালেন যে সূর্যকুমারের সঙ্গে ওঁর কথা হয়ে গেছে। উনি খাতাটা বিক্রি করবেন না বলে দিয়েছেন।

'ভালো কথা।' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমার জাদুকর নিয়ে একটা ভালো প্লট মাথায় এসেছে। ভাবছিলাম, সূর্যকুমারের সঙ্গে কী করে একটু কথা বলা যায়।'

'ওকে হোটেলে ফোন করুন।' বলল ফেলুদা, 'কোন্ হোটেলে আছে সে ত যারা আমাদের টিকিট দিয়েছিল, তারাই বলে দেবে।'

'তা বটে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে লালমোহনবাবু সূর্যকুমারের সঙ্গে কথা বলে, তার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিলেন আমাদের বাড়িতেই। ভদ্রলোক আগামীকাল সকালে সাড়ে ন'টায় আসবেন।

'আপনি কিন্তু আমাকে দেখলেই চিনবেন।' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি সেদিন আপনার দ্বারা হিপ্‌নোটাইজ্‌ড হয়েছিলাম!'

পরদিন একটা মারুতি গাড়িতে ঠিক সাড়ে ন'টার সময় সূর্যকুমার এসে হাজির। লালমোহনবাবু অবিশ্যি মিনিট কুড়ি আগেই চলে এসেছিলেন। সূর্যকুমার ফেলুদাকে দেখে কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনার পরিচয়টা পেতে পারি কি? আপনাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে।'

ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র। হয়তো খবরের কাগজে ছবি দেখে থাকবেন।'

'প্রদোষ মিত্র মানে গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার পরম সৌভাগ্য।'

'সৌভাগ্য ত আমারও। আপনার মতো একজন দক্ষ ম্যাজিশিয়ানের পায়ের ধুলো পড়ল আমাদের বাড়িতে, সেও কি কম সৌভাগ্য?'

চায়ের পর লালমোহনবাবু প্রশ্ন আরম্ভ করলেন।

'আপনি কদ্দিন ম্যাজিক দেখাচ্ছেন?'

'তা বারো বছর হল।'

'কারুর কাছে শিখেছেন কি?'

'আমি নক্ষত্র সেন ঐন্দ্রজালিকের সহকারী ছিলাম পাঁচ বছর। তাঁর বয়স হয়েছিল— স্টেজেই ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে স্ট্রোক হয়ে মারা যান। তাঁর সব ম্যাজিকের সরঞ্জাম আমার হাতে পড়ে। আমি তাই দিয়েই শুরু করি।'

'আপনাকে কি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে খেলা দেখাতে হয়?'

'হ্যাঁ। শুধু ভারতবর্ষ কেন, আমি জাপান আর হংকংও গিয়েছি।'

'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আগামী বছর সিঙ্গাপুর থেকে নেমন্তন্ন আছে।'

'আপনার ফ্যামিলি নেই?'

'না। আমি ব্যাচেলর।'

'এখনও ম্যাজিক অভ্যাস করতে হয় আপনাকে, না আর দরকার হয় না?'

'এখনো সকালে দু'ঘন্টা হাত-সাফাই প্র্যাক্‌টিস করি। ওটা থামালে চলে না।'

এবার ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

'আপনার সঙ্গে সোমেশ্বর বর্মনের বোধহয় আলাপ হয়েছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি ত ভারতীয় জাদুবিদ্যার পাণ্ডুলিপিটা কিনতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম আমার বিলিতি ম্যাজিকের মধ্যে কয়েকটা দিশি আইটেম ঢোকাতে পারলে অ্যাট্রাকটিভ হবে। কিন্তু ভদ্রলোক বই বিক্রি করলেন না। আমি বিশ হাজার অফার করেছিলাম। তবে বিক্রি না করলেও, ওঁর সঙ্গে আমার একটা খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কারণ আমি ওঁকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি। উনি আমার শো শেষ হলে পর ওঁর বাড়িতে গিয়ে আমাকে কয়েকদিন থাকতে বলেছেন।'

'আপনার শো শেষ হচ্ছে কবে?'

'এই রবিবার।'

'এর পর কোথায় যাওয়া?'

'দিন সাতেক বিশ্রামের পর পাটনা যাব।'

লালমোহনবাবুর আরো দু-একটা প্রশ্ন ছিল, তারপরেই ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। আমারও ভদ্রলোককে খারাপ লাগল না।

ফেলুদা বলল, 'বিদেশী জামাকাপড় জুতো পরেছে। বোধহয় জাপান কি হংকং-এ কেনা। এমনিতে বেশ সৌখিন লোক, যেমন ম্যাজিশিয়ানরা সাধারণত হয়।'

'সোমেশ্বরবাবুদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন বলুন?' বললেন লালমোহনবাবু, 'নইলে আর বাড়িতে এসে থাকতে বলে!'

৪

এ সপ্তাহটা আর কোনো ঘটনা ঘটল না। তারপর যেটা হল, সেটা একেবারে বজ্রপাত! মঙ্গলবার দিন সোমেশ্বরবাবু ফোন করে জানালেন যে তাঁর বাড়িতে খুন হয়েছে তাঁর বহুদিনের বেয়ারা অবিনাশ, আর সেইসঙ্গে সিন্দুক থেকে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ হাওয়া! একসঙ্গে ডবল ট্রাজেডি!

ফেলুদা তৎক্ষণাৎ লালমোহনবাবুকে ফোন করে বলে দিল সোমেশ্বরবাবুর বাড়িতে আসতে, আর আমরা ট্যাক্সি করে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি, পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে। ইনস্পেক্টর ঘোষ ফেলুদার চেনা, দেখে বললেন, 'স্রেফ ডাকাতির কেস। খুন করার কোনো মতলব ছিল না; সামনে বাধা পেয়ে খুন করেছে। আসল উদ্দেশ্য ছিল সিন্দুক থেকে ওই কৃষ্ণটা নেওয়া। এ বাইরের লোকের কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সেদিন একটা ডাকাতির কেস হয়ে গেছে।'

'ওই কৃষ্ণের কথা কিন্তু এ বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানত না।'

'তাহলে এ বাড়ির ভেতর থেকেই ব্যাপারটা হয়েছে। সোমেশ্বরবাবুর ছেলে আছেন, সেক্রেটারি আছেন, বন্ধু আছেন, আর্টিস্ট রণেন তরফদার আছেন, সূর্যকুমার বলে সেই ম্যাজিসিয়ান কাল থেকে এখানে রয়েছেন; এর মধ্যেই কেউ গিল্‌টি। আর তাই যদি হয়, তাহলে ত আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে।'

'খুনটা কখন হয়েছে?'

'রাত একটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'বেয়ারা কি চোরকে বাধা দিতে গেসল?'

'তাই ত মনে হচ্ছে।'

আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। একতলার বৈঠকখানায় সোমেশ্বরবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। ঘরে আর সকলেই রয়েছে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ চেয়ারে বসে।

ফেলুদা সোমেশ্বরবাবুকে বলল, 'ঘটনাটা একটু বলবেন? এই বেয়ারা কি আপনার অনেকদিনের বেয়ারা?'

'ত্রিশ বছর। অবিনাশের মতো ভালো লোক পাওয়া খুব দুরূহ।'

'খুনটা কোথায় হয়?'

'একতলায়। চোর সিন্দুক থেকে কৃষ্ণটা নিয়ে পালাচ্ছিল, সেই সময় হয়ত অবিনাশের ঘুম ভেঙে যায়। সে চোরের সামনে পড়ে, হয়তো তাকে ধরতে যায়; সেই সময় চোর তাকে ছুরি মেরে খুন করে।'

'আপনারা কে কোথায় শোন্, জানতে পারি?'

'আমার ঘর ত আপনি দেখেইছেন। আমি আর অনিমেষ দোতলায় শুই। বাকি সকলে একতলায় শোয়। কাল সূর্যকুমার এখানে এসেছেন ক'দিনের জন্য, তাকে একতলায় একটা গেস্ট-রুম দিই।'

'কিন্তু আপনার এই কৃষ্ণর কথা ত বাইরের কেউ জানত না?'

'তা ত না-ই। অথচ বাড়ির কেউ এমন কাজ করে থাকতে পারে, সেটা ভাবা অসম্ভব মনে হচ্ছে।'

'আপনার বালিশের নীচ থেকে চাবি নিল, আর আপনি টের পেলেন না?'

'আমি যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোই। সে গভীর ঘুম।'

'সিন্দুকের চাবিটা কি রেখে গেছে?'

'হ্যাঁ। সেটা তালাতেই ঝুলছিল।'

'যে অস্ত্রটা দিয়ে খুন হয়েছিল, সেটা পাওয়া গেছে?'

'না।'

ইনস্পেক্টর ঘোষ এ সময় এসে বললেন, তিনি সকলকে জেরা করতে চান।

ফেলুদা বলল, 'আপনার জেরার পর আমি যদি একটু জেরা করি, তাহলে আপনার আপত্তি নেই ত?'

'মোটেই না। আপনার কীর্তিকলাপের সঙ্গে আমি বিলক্ষণ পরিচিত। নইলে প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমরা বিশেষ পাত্তা দিই না।'

ইনস্পেক্টর ঘোষ সোয়া ঘন্টা ধরে সকলকে জেরা করলেন। আমরা ততক্ষণ চা-টা খেলাম। সোমেশ্বরবাবু যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন— খুনের ব্যাপারেও, চুরির ব্যাপারেও। কিন্তু তাতে আতিথেয়তার কোনোরকম ত্রুটি হল না।

আমরা চা খেয়ে বাইরে বাগানে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ইনস্পেক্টর ঘোষ এসে বললেন, 'আমার কাজ শেষ। এবার আপনি টেক-ওভার করুন।'

ফেলুদা ভিতরে গিয়ে প্রথমেই সোমেশ্বরবাবুর ছোট ছেলে নিখিলবাবুকে নিয়ে পড়ল। আমরা নিখিলবাবুর ঘরেই বসলাম।

ফেলুদা প্রথমেই জিগ্যেস করল, 'আপনি কী করেন?'

'আমার একটা অকশন-হাউস আছে মিরজা ঘালিব স্ট্রীটে।'

'কী নাম?'

'মডার্ন সেল্‌স ব্যুরো।'

'জানি, দোকানটা দেখেছি।'

'তা দেখে থাকতে পারেন। ওখানে আমি সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত থাকি।'

'ব্যবসা কী রকম চলে?'

'ভালোই।'

'আপনি আর্ট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড?'

'আমার কাজের মধ্যে দিয়ে ত অনেক রকম আর্টের জিনিসপত্র আমাদের ঘাঁটতে হয়। সেই সূত্রে বেশ কিছু জানা হয়ে গেছে।'

'কত বছর হল আপনি এ কাজ করছেন?'

'সাত বছর।'

'আপনার বয়স কত?'

'তেত্রিশ চলছে।'

'আপনার দাদা আপনার চেয়ে কত বড়?'

'তিন বছর।'

'দাদার সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

'দাদা মিশুকে ছিলেন না। কথাও বেশি বলতেন না, বন্ধু-বান্ধবও বেশি ছিল না। সত্যি বলতে কী, দাদার কারুর উপরেই টান ছিল না— এমনকি আমার উপরেও না।'

নিখিলবাবুর কথা শুনে আমার কেন যে একটু অদ্ভুত লাগছিল, সেটা কিছুতেই ভেবে বের করতে পারলাম না।

'বিদেশ গিয়ে দাদা আপনাকে চিঠি লেখেননি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না। শুধু আমাকে না, কাউকেই লেখেননি।'

'বাবার ম্যাজিকে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না?'

'নিশ্চয়ই ছিল। তবে বাবা ত বেশিরভাগ ম্যাজিক বাইরে দেখাতেন; সেগুলো আর আমার দেখা হত না।'

'নিজে ম্যাজিক করার শখ হয়নি?'

'তা হয়নি। শুধু দেখতেই ভালো লাগত।'

'এই যে অঘটনটা ঘটল, এটার জন্য কে দায়ী, সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'না। একেবারেই নেই। তবে বাবাকে আমি অনেকবার বলেছি কৃষ্ণটা বাড়িতে না রেখে ব্যাঙ্কে রাখা উচিত। বাবা আমার কথায় কান দেননি।'

নিখিলবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে, আমরা সোমেশ্বরবাবুর বন্ধু অনিমেষবাবুর কাছে গেলাম।

খাট আর চেয়ার ভাগ করে আমরা বসলাম ভদ্রলোকের ঘরে।

ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'আপনি কী করেন?'

'আমি কিছুই করি না।' বললেন অনিমেষবাবু, 'আমার বাবা ছিলেন উকিল। তিনি অনেক তলার একটা বাড়ি তৈরি করে গেসলেন, সেটার ভাড়া থেকেই আমার চলে যায়।'

'সোমেশ্বরবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কত দিনের?'

'তা প্রায় ত্রিশ বছর।'

'কী করে সূত্রপাত হয়?'

'আমি এককালে জ্যোতিষ করতাম। সোমেশ্বর আমার কাছে এসেছিল তার ভাগ্য গণনা করাতে। ও তখন সবে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেছে। আমি ওর ভবিষ্যতের খ্যাতির কথা বলে দিই। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে ও আমার বাড়িতে আবার আসে, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সেই তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। সোমেশ্বরের স্ত্রী মারা যাবার পর ও আমাকে ওর বাড়িতে এসে থাকতে বলে— বোধহয় একাকীত্ব খানিকটা কাটবে বলে। তখনই আমি চলে আসি। সে আজ পনেরো বছর হল।'

'পঞ্চরত্নের কৃষ্ণটা আপনি কবে দেখেন?'

'ওটার কথা ত আমি আমার গণনায় বলি। ওটা পাওয়া মাত্র ও আমাকে দেখায়।'

'এই চুরি এবং খুন কে করতে পারে, সে বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'বাড়ির চাকরের সঙ্গে যোগসাজশ আছে, এমন কোনো চোর বলেই আমার বিশ্বাস। আমার ধারণা, ও সিন্দুক খুলে টাকা নিতে গেসল। তারপর সামনে ওই ঝলমলে কৃষ্ণটা দেখে, সেইটে নিয়ে নেয়। বাড়ির কোনো লোক এ ব্যাপারে জড়িত, এ বিশ্বাস করতে আমার মন চায় না।'

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রমশ

প্রসাদরঞ্জন রায়

গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের পর বিশ্বকাপ ক্রিকেট—আহা, 'সন্দেশী' কুইজ-এর কী বাহার! প্রতি মাসে এক-একটা বিষয় ধরে ধরে এই যে কুইজ-এর আসর—তোমাদের মনে ধরেছে তো? 'সন্দেশ' আপিসে উত্তর পাঠাতে হবে না, পরের মাসের 'সন্দেশ' দেখে মিলিয়ে নাও।

১। বিশ্বকাপে প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন কে?

২। বিশ্বকাপে আজ এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রান করেছেন কে?

৩। বিশ্বকাপে আজ পর্যন্ত ভারতের রেকর্ড রানরেট কী?

৪। কোন্ বিশ্বকাপ ফাইনালে বিজয়ী দলের অধিনায়কই 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ'-এর সম্মান পেয়েছেন?

৫। কোন্ ম্যাচে দু'জন খেলোয়াড় 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' হয়েছেন?

৬। টেস্ট খেলা হয়নি এমন কোন্ কেন্দ্রে প্রথম বিশ্বকাপের খেলা হয়?

৭। বিশ্বকাপে ন' বার ৫০'এর বেশি রান করেছেন তিনজন ব্যাটসম্যান। কে তাঁরা?

৮। একই বিশ্বকাপে কোন্ বোলার সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন?

৯। একই বিশ্বকাপে চারবার ৫০ রান করেছেন কোন্ ভারতীয়?

১০। একই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ধরেছেন কে?

১১। ১১-১২ জুন, ১৯৭৫ ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজীল্যান্ড বিশ্বকাপ ম্যাচে কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল যা আর কোনও বিশ্ব কাপ ম্যাচে দেখা যায়নি?

১২। কোন্ দু'জন বিশ্ব কাপ খেলোয়াড় অন্যান্য দলের হয়ে টেস্ট খেলেছেন?

১৩। ১৯৭৫, বার্মিংহাম ঃ পাকিস্তান ২৬৬-৭ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০৩-৯। শেষ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ম্যাচ জেতাল কারা?

১৪। বিশ্বকাপে বিষেন বেদীর নামে কী বিশ্বরেকর্ড আজও আছে?

১৫। বিশ্বকাপে কোন্ ম্যাচটি সবচেয়ে কম সময়ে শেষ হয়েছে?

১৬। ১৯৭৫-এর বিশ্ব কাপে আমি ডেনিস লিলির শেষ ১০ বলে ৩৫ রান করি—৭টা চার, ১টা ছয়, ১টা খুচরো রান সমেত। তারপরে লিলির বলেই আউট হই, কিন্তু ম্যাচ তখন জেতা হয়ে গেছে। কে আমি?

১৭। একটি বিশ্বকাপ মরশুমেই আমি খেলার সুযোগ পেয়েছি। আমিই একমাত্র খেলোয়াড় যে বিশ্বকাপে একটি ম্যাচেই ৫০-

এর বেশি রান করেছি এবং চারটি উইকেট পেয়েছি এমনকি 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ'। আমি দলের ক্যাপ্টেন ও বটে। কে আমি?

১৮। বর্তমানে আমি দলের নিয়মিত ওপেনার। ১৯৯১-৯২ বিশ্বকাপে আমি একদিনের ম্যাচে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করি। তখন আমার বয়স ২৩ বছর ৩০১ দিন। বিশ্বকাপ সেঞ্চুরিয়ানদের মধ্যে আমি কনিষ্ঠতম।
কে আমি?

১৯। আমি চেতন শর্মা। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে হ্যাটট্রিক করেছিলাম আমি। প্রথম আউট করি কেন রাদারফোর্ডকে, তারপর ইয়ান স্মিথকে। সব শেষে কাকে আউট ক'রে হ্যাটট্রিকের সম্মান পাই?

২০। আমাকে বলা হ'ত একদিনের ম্যাচের সেরা অল-রাউন্ডার। পরপর তিন বছর হংকং-এ সিল্ক কাট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হই—সেরা অলরাউন্ডারের পুরস্কার পাই— বথাম, হ্যাডলি, ইমরান ও কপিলকে হারিয়ে। অথচ বিশ্বকাপে আমি অল্পের জন্য খেলার সুযোগ পাইনি। কে আমি?

ছবি : সত্যজিৎ রায়

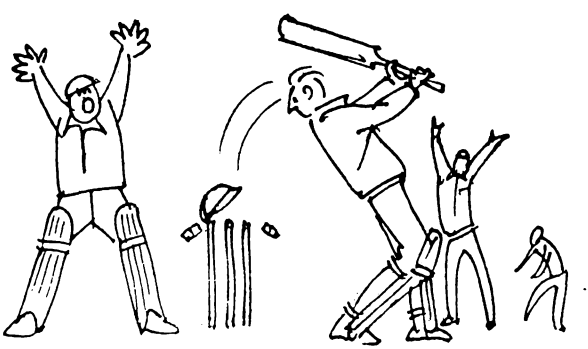

গত মাসের উত্তর

১। জয়কৃষ্ণ মিত্র।
২। ষমন্তক মূর্তি।
৩। শিবকুমার শেলভাষ্কারের প্রথম সন্তান বীরেন্দ্র।
৪। অনিমেষ সোম।
৫। ইটালির কারিগর আমাটি-র তৈরি বেহালা।
৬। চারমিনার।
৭। 'সোনার কেল্লা'র ভিলেন অমিয়নাথ বর্মনের প্রাক্তন ছদ্মনাম।
৮। খগেন জ্যোতিষী।
৯। রাজেন রায়নার আসল নাম।
১০। ৩১ নম্বর খণ্ড।
১১। হামানদিস্তা।
১২। শশধর বসু ওরফে ডাক্তার বৈদ্য।
১৩। 'এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর'।
১৫। ১২১২৮—৭৪
১৬। জাল উইল।
১৭। গোল্ডেন সার্কাস।
১৮। রাধাকান্ত মল্লিক।
১৯। হরেনডাস্।
২০। হনুমান রাউত।

পুঃ গত মাসের কুইজ-এর ১৪ নম্বর প্রশ্নটাকে ছাপাখানার ভূতেরা স্রেফ গিলে খেয়েছে, ছিঃ!

ফেলুদাকে নিয়ে মুশকিল

পবিত্র সরকার

ফেলুদাকে নিয়ে আমার খুব মুশকিল। আমার নানা কাজ, বইপত্রের দিকে তাকানোরই সময় নেই বলতে গেলে। কবে কী লেখাপড়া করেছিলাম, তার প্রায় সবই ভুলে গেছি। এখন শুধুই সরকারি নানা চিঠি পড়ি, আর আমিও নানা সরকারি চিঠি লিখি—সরকারি মানে অফিসের। তার মধ্যে দেখি বাড়িতে এখানে-সেখানে পড়ে থাকে ফেলুদার বই। আর এখানে-সেখানে পড়ে থেকে আমাকে পাগলের মতো টানতে থাকে। আমি সে-বইয়ের উপর গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি। আর একবার হাতে সে-বই নিলে, তাকে ছেড়ে উঠে আসে কার সাধ্যি!

ফেলুদার বইগুলোর একটা অদ্ভুত বদ্-অভ্যেস আছে। একই বই কী করে যেন দু'খানা-তিনখানা করে বাড়িতে এসে যায়! খুব তাড়াতাড়ি তারা নিজেদের ছিঁড়ে একটা অচেনা চেহারা করে ফেলে, বা কোথাও লুকিয়ে ফেলে। তখন আবার একটা বই কিনতেই হয়। বা অন্য কোনোভাবে পেতে হয়। এইরকম করে 'বাদশাহী আংটি'-ই বোধহয় খানপাঁচেক হয়ে গিয়েছিল। সব কি আর আমরা কিনেছি? লোকেও এমন বেয়াক্কেলে যে, আমার মেয়েরা যখন ছোট ছিল—একজন এখনও মোটামুটি ছোট আছে—তখন তাদের জন্মদিনে তারা ঝুড়ি-ঝুড়ি ফেলুদা উপহার দিত। এক-একবার এমন মনে হয়েছে যে, বলে দিই, বা লিখে দিই—'উপহারের জন্য দয়া করিয়া ফেলুদার বই আনিবেন না!' মেয়েরাও হয়তো ভেবেছে তাদের ভাই বোন বন্ধু কাকু জেঠু মাসি পিসি মেসো পিসে দাদু দিদাদের জানাবে—'ফেলুদা আনলে কিন্তু আড়ি আড়ি আড়ি!'

কিন্তু না আমি, না আমার মেয়েরা—কেউ বুক বেঁধে শেষপর্যন্ত কথাগুলি বলতে পারিনি। পারব কী করে? দু'পক্ষই তো ভেবেছি—যত বেশি ফেলুদা পাওয়া যায়, ততই ভালো। একটাই বই যদি দশ কপি পাই তো কী আছে? একটা পড়ার বইয়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়বার জন্য। একটা খাবার টেবিলে বসে বাড়ির কর্ত্রীর বকুনি খেতে খেতে পড়বার জন্য। একটা সিঁড়ির কোণায় পুরনো খবরের কাগজ গোছাতে গোছাতে পড়বার জন্য। একটা ঘুমোবার আগে পড়ে বালিশের পাশে রাখবার জন্য। একটা দুধের কার্ড করতে গিয়ে বা র‍্যাশন তুলতে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়বার জন্য। একটা বাসের দমাদ্দম দুলুনিতে বসে পড়বার জন্য। এইরকম যত হয়, ততই ভালো। আর তোমরা বাপু নিন্দেই করো আর ঘেন্নাই করো—আমি তো বাথরুমেও বই নিয়ে যাই! অর্থাৎ যেখানে হাত দেবো, সেখানেই যেন একটা ফেলুদার বই পেয়ে যাই—এইরকম একটা ইচ্ছে এই বাড়িটাকে দখল করে ফেলেছে!

তা আমার তো প্রচুর বয়স হয়েছে। ফেলুদাকে তো আমরা প্রথমে বইয়ে পড়িনি, পত্রিকায় পড়েছি। প্রথমে 'সন্দেশ'-এ, তারপর প্রায়ই 'সন্দেশ'-এর 'সন্' বাদ দিয়ে শুধু 'দেশ'-এ। বছর-বছর পুজোর সময় অপেক্ষা করে থাকতাম, ফেলুদার নতুন কী কাণ্ডকারখানা বেরোল। বাড়িতে 'সন্দেশ' বা 'দেশ'-এর শারদ-সংখ্যা এলে, সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড! কে সেটা আগে নিয়ে নেবে!

সকালে একজন ঘুম থেকে উঠেই সেটা কব্জা করে নেয়, তো তার চোখে ফাঁকি দিয়ে আর-একজন সেটা

ফেলে দেওয়া জিনিসপত্রের ঘিঞ্জি গুদামঘরে পুরনো ক্যালেন্ডারের নীচে লুকিয়ে রাখে, আর-একজন তাই নিয়ে বাড়ি মাথায় করে! শেষপর্যন্ত ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি মান-অভিমান অনুযোগ অভিযোগ বা গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে তর্ক-বিতর্ক সবই চলে। এ-সবই টাটকা টাটকা ফেলুদা পড়বার জন্য! তবে এইটেই আশ্চর্য যে, বারবার পড়ে ফেলবার পরেও, ফেলুদা একইরকম টাটকা থাকে!

সেই কবে থেকে ফেলুদা পড়ছি, বলো। 'বাদশাহী আংটি' যখন বই হয়ে বেরোল, তখন তো তোমাদের অনেকের জন্মই হয়নি, সেই ১৯৬৯ সাল। অবিশ্যি 'বাদশাহী আংটি' আগে পড়েছি ধারাবাহিকভাবে, তারও আগে 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি'—দুটোই 'সন্দেশ'-এর পাতায়। এমনিতে আমার ফেলুদাকে পছন্দ করার কথাই তো নয়। আমি বেঁটে (আমার উচ্চতা জটায়ুর মতোই—পাঁচ ফুট চার, যদিও 'সোনার কেল্লা'য় পাঁচ ফুট সাড়ে তিন আর 'বাক্স-রহস্য'তে চার ইঞ্চি আছে), ফেলুদা ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা। ফেলুদা দারুণ হ্যান্ডসাম, বোধহয় খানিকটা গ্রেগরি পেক, রবার্ট রেডফোর্ড আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মিশিয়ে দেখতে—'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'তে তো পুলক ঘোষাল ফেলুদাকে হিন্দি ছবির হিরো-র পার্ট দিতেই চেয়েছিলেন। আর আমি কালো, হোঁৎকা, টাকমাথাওলা ভেতো বাঙালি। ফেলুদা দারুণ বুদ্ধিমান, আমার বুদ্ধি ভগবানের র‍্যাশনের দোকান থেকে পাওয়া। ফেলুদা দারুণ ক্রিকেট খেলত, স্লো-স্পিন বল দিয়ে বেনারস, লখ্‌নৌ পর্যন্ত খেলে গেছে, আর আমার ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান হল শূন্য। ফেলুদা সব অপরাধীদের চমৎকার ঘোল খাইয়ে ছাড়ে, আর আমি পাছে তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যায়—সেই ভয়ে চারদিক বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করি। ফেলুদার যেমন সাহস, আমার তেমনি ভয়।

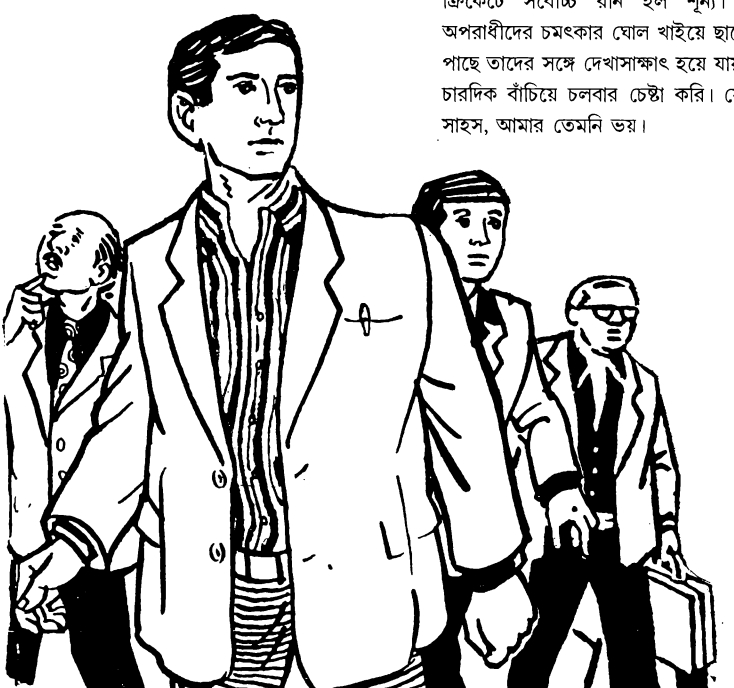

এমন লোককে আমার পছন্দ হবে কেন? হত যদি হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত বা শরদিন্দুর ব্যোমকেশ—তাহলে না-হয় একটা কথা ছিল। তারা নেহাতই মধ্যবিত্ত বাবু, ভদ্রলোক—বাঙালিদের ভিড়ে তারা অনায়াসেই মিশে যেতে পারে। শুধু সাহস আর বুদ্ধি দিয়ে তারা আমার সঙ্গে টক্কর দেয়। তাদের উপর এতটা হিংসে হয় না, ফেলুদার উপর যেমন হয়। ফেলুদা যেন আসলে সাহেব, ভুল করে বাঙালির ঘরে জন্মে ফেলেছে। তাও ভালো, 'বাদশাহী আংটি'তে একবার দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিক্ করে রাস্তায় খানিকটা পানের পিক ফেলেছিল—তাতে আমি একটু স্বস্তি পেয়েছিলাম। যাক্ বাবা, যতই সাহেব হোক, বাঙালিদের দু-একটা ভালো অভ্যেস আছে দেখছি ভদ্রলোকের! আর ফেলুদা প্রচুর চারমিনার খায়। এটাও আমার একদম পছন্দ নয়, আমি মনে করি সিগারেট খাওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। কিন্তু অত বুদ্ধি যাদের, তাদের তো 'বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতেই হয়' মাঝে-মধ্যে—তাই না? ফেলুদা তো বিয়ে-থা করেনি ব্যোমকেশের মতো—একা মানুষের, বা একা চিন্তা করবার সময়, খুব ভালো সঙ্গী নাকি এই সিগারেট—এ কথা আমার বন্ধুরা প্রায়ই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। সে আমি বুঝি আর নাই বুঝি, ফেলুদার মতো তুখোড় মানুষকে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি না হয় দিয়েই দিচ্ছি। অত নিখুঁত নাই বা হল!

ফেলুদার উপর হিংসে হলেও যেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল, সেটা 'সোনার কেল্লা'য় তার ওই কথা—'আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল এই যে, প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা বোকামো।' ফেলুদার গল্পে জাতিস্মর, 'নয়ন রহস্য', ভবিষ্যদ্‌বক্তা ইত্যাদি এসে যায় বটে; কিন্তু শেষপর্যন্ত রহস্যের সমাধান ঘটে খাঁটি যুক্তি আর প্রমাণেরই জোরে।

ফেলুদাকে হিংসে আর পছন্দ করার এই দোটানা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আর-একটা মজার ব্যাপার আছে। ফেলুদাদের আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় সোনাদিঘি গ্রামে ('রয়েল বেঙ্গল রহস্য')। কী আশ্চর্য দ্যাখো, আমার বাড়িও ঢাকা জেলায়, যদিও বিক্রমপুরে নয়—বিক্রমপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি! অর্থাৎ ফেলুদাও বাঙাল, আমিও বাঙাল। অত তফাতের মধ্যে এমন একটা দারুণ মিল পেলে, কে না খুশি হয় বলো! তোমাদের মধ্যে যারা বাঙাল নও, তাদের এতে হয়তো একটু মন-খারাপ হতে পারে, কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ই অন্যদিক থেকে মিল আছে ফেলুদার সঙ্গে। কেউ তার মতো লম্বা বা লম্বা হতে চলেছ, কেউ তার মতোই স্মার্ট আর সুন্দর, কেউ তার মতোই বুদ্ধিমান। কাজেই কেউ এই সামান্য সুখটুকুর জন্য আমাকে হিংসে কোরো না, কেমন?

এই যে ফেলুদা চাকরি-টাকরি করে না, নিজের সময়ের উপর নিজেই রাজত্ব করে—এর জন্যও লোকটির উপর আমার হিংসে। কী অফুরন্ত সময় পায় পড়াশোনা করবার! রাজস্থান যাবে তো রাজস্থান সম্বন্ধে একগাদা বই পড়ে ফেলল। বম্বে—থুড়ি মুম্বই (তোপ্‌সের কায়দাতেই লিখলাম কথাটা) যাবে তো বম্বে সম্বন্ধেই পড়াশোনা করে নিল। এক সিধুজ্যাঠাই ফেলুদার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পড়াশোনা করেন। কিন্তু সিধুজ্যাঠা মূলত পড়ুয়া আর সংগ্রাহক। নানান জিনিস জোগাড় করেন তিনি। ফেলুদার মতো দৌড়োদৌড়ির ব্যাপারটাই তাঁর নেই। আজ ফেলুদা রাজপুতানায়, কাল মুম্বই-এ, পরশু দার্জিলিঙে, তার পরদিন কাঠমাণ্ডুতে, তারপর একবার সিকিমে, হাজারিবাগে বা সিমলায়। ফেলুদার বই পড়লে, রুদ্ধশ্বাস ভ্রমণেরও অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। কারণ ফেলুদা যেমন করে দেখে, আমরা কেউ তো তেমন করে দেখি না। মনে নেই 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এ সেই কথাগুলি : 'কোন নতুন জায়গায় এলেই, আগেও দেখেছি, ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে খায়। আরেক দিন যদি আমরা এ রাস্তা দিয়ে যাই, আমার বিশ্বাস ফেলুদার পর পর সব দোকানের নাম মুখস্থ হয়ে যাবে।'

ওই আমার আর-একটা হিংসের জায়গা। এত দৃষ্টিশক্তি, এত স্মৃতিশক্তি কেন হবে—যে লোকটা এমনিতেই এত রূপে-গুণে সাংঘাতিক? কিন্তু সে ভেবে আর কী করব, বলো। আমার স্মৃতিশক্তি তো ভয়ংকর, সকালেরটা বিকেলে মনে থাকে না। চোখেও পড়ে না প্রায় কিছুই, অথচ ফেলুদা কত সহজে কারও আঙুলের

আংটিতে 'মা' কথাটা বাংলায় লেখা দেখেই বলে দিতে পারে যে সে বাঙালি! আর শুধু দৃষ্টি বা স্মৃতি নয়, তার সঙ্গে ঘ্রাণশক্তি! সে গন্ধ শুঁকেই বলে দেয় কে গায়ে ডেনিমের গন্ধ লাগিয়েছে, কে ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডারের। কাশীর ঘাটের মন্দিরের সমস্ত গন্ধ তার অ্যাদ্দিন পরেও মনে থাকে! সত্যি, কী লোক!

আর তার যিনি স্রষ্টা, সেই মানুষটিও বেশ একটা কায়দা করেছেন। ফেলুদার চারপাশে এমন সব মানুষ ছেড়ে দিয়েছেন, যারা থাকার ফলে ফেলুদাকে আরও দারুণ বলে মনে হয়। সিধুজ্যাঠা শুধু পড়েন আর জানেন, ফেলুদা শুধু পড়েন জানেন না, তিনি দেখেন, দৌড়োন আর অপরাধীকে আবিষ্কার করে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েন। জটায়ু তো বিশেষ একটা ঘটনা! তিনি নিজে মজার লোক, নিজের অজান্তেই দারুণ সব হাসির ব্যাপার তৈরি করেন, নানারকম বোকামি দেখান, এমনকী 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'তে ফিল্মের একটা গল্পও তিনি ফেলুদার ডিক্টেশনে লিখে ফিল্মের লেখক হয়ে দশ হাজার টাকা পেয়ে যান—আর তাই তার তুলনায় ফেলুদার বুদ্ধি কল্পনা পর্যবেক্ষণ-জ্ঞান সবই কেমন অসাধারণ মনে হয়। 'ফেলুদা অ্যান্ড কোং'-এর মধ্যে অবশ্য তোপ্‌সে বেশ বুদ্ধিমান—ফেলুদা একজায়গায় বলেও দিয়েছে যে দশ বছর লেগে থাকলে সে প্রদোষ মিত্তির না-হোক, মোটামুটি ভালো গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারবে!

তোপ্‌সে আর জটায়ু দু'জনেই আমাদের খুব প্রিয় চরিত্র। কিন্তু গল্পে বৈচিত্র্য তৈরি করে আমাদের প্রিয় চরিত্র হওয়া ছাড়াও, তাদের এই কাজটা তারা বেশ ভালোভাবে করে—অর্থাৎ তাদের তুলনায় ফেলুদা যে অনেক বড়, সেটা তারা প্রতিমুহূর্তে বুঝিয়ে দেয়। আর মগনলাল মেঘরাজের মতো একজন ভয়ংকর বুদ্ধিমান প্রতিদ্বন্দ্বীও যখন ফেলুদার কাছে ঘায়েল হয়, তখন ফেলুদার উচ্চতা তো আকাশ ছুঁয়ে ফেলে!

এই সব কারণে ফেলুদাকে প্রায়ই হিংসে করি, আবার খুব ভালোও বাসি। ভালোবাসার আর-একটা কারণ তোমাদের বলা হয়নি। দেখছি, ফেলুদাও ভালো ভালো জিনিস খেতে ভালোবাসে, সেটা মনে করে রেখে দেয়। নিউ মার্কেটের কলিমুদ্দির দোকান থেকেই সে ডালমুট কেনে, আর মিইয়ে যাওয়া ডালমুট সে মুখেও দেয় না ('যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে')। সেই কবে কলেজের ছাত্র হয়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির টিমের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিল, তখন কচৌরি গলির হনুমান হালুইকরের যে রাবড়ি খেয়েছিল, তার স্বাদ তার মুখে লেগে থাকে ('জয় বাবা ফেলুনাথ')!

বলো তো, হিংসেও করি, আর দারুণ ভালোও বাসি—এমন লোককে নিয়ে মুশকিল নয়?

নতুন 'সন্দেশ'-এর নতুন আকর্ষণ!

পুরনো 'সন্দেশ' থেকে

আধুনিক বাংলা শিশু-সাহিত্যের জনক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর-ই হাতে 'সন্দেশ' পত্রিকার পত্তন ১৩২০/১৯১৩ সালে। প্রথম দুই পর্যায়ে 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেছেন আরও দু'জন। সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়। ১৩৬৮/১৯৬১ সাল থেকে তৃতীয় পর্যায়ে 'সন্দেশ'-এর সম্পাদক হয়েছেন পাঁচজন। সত্যজিৎ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও বিজয়া রায়। এই তিন আমলেরি পুরনো 'সন্দেশ' থেকে বাছাই করা দারুণ সব লেখা এবং ছবি—নতুন 'সন্দেশ'-এর নতুন আকর্ষণ!

গল্প, উপন্যাস, জীবন-কথা, ছড়া ও কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, স্মৃতিকথা, নাটক, রূপকথা-উপকথা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কমিক্স, এমনকি ইলাস্ট্রেশন—মাসে মাসে কিছু-না-কিছু থাকছেই—আহা, সাত রাজার ধন! চিরকেলে, অফুরন্ত হীরে-মানিক!

মনে রেখো, 'সন্দেশ' শুধু ছোটদের সেরা মাসিকপত্র-ই নয়, ১৯১৩ সাল থেকেই ভারতবর্ষের একটা জোরালো সাংস্কৃতিক আন্দোলন!

সন্দেশ

লীলা মজুমদার ও বিজয়া রায় সম্পাদিত
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯। ফোন ৪৬৬-৪৯১৯
নিউ স্ক্রিপ্ট-এর দোকান এ-১৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭

তাজ্জব ডিম

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডক্টর ব্রজমোহন বসু প্রতি বৎসর আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে বেড়াতে যান এবং নানারকম আশ্চর্য ও সুন্দর জিনিস সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। এ বছর তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে—লোককে দেখাবার মত কিছুই এবার তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। ক্ষুণ্ণমনে সেই কথা ভাবতে ভাবতে নির্জন নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন এমন সময়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর একটা সাদা জিনিসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল—কাছে গিয়ে দেখলেন, অতি প্রকাণ্ড একটা ডিম! এমন রাক্ষুসে ডিম তিনি কখনো চোখেও দেখেন নি, কোন বইয়েও পড়েন নি; সুতরাং অতি আশ্চর্য এক নতুন জিনিস সংগ্রহ করেছেন ভেবে, আহ্লাদে তাঁর প্রাণ নেচে উঠল। তাড়াতাড়ি তিনি অতি সন্তর্পণে ডিমটি তুলে নিয়ে, সোজা গিয়ে লোকজন ডেকে, কলকাতাগামী জাহাজে চড়লেন।

জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে খালাসী সবাই এই অদ্ভুত ডিমটিকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখেছিল। কিন্তু অত বড় পণ্ডিত মানুষ, এবং সর্বদাই এদিকে যাওয়া আসা করেন, সেই খাতিরে সেটাকে জাহাজের গুদাম ঘরের এক কোণে রেখে দিতে কেউ আপত্তি করল না।

দিন আষ্টেক পরে হঠাৎ ভোরবেলা একজন খালাসীর বিকট চিৎকারে ডক্টর বসুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে ডিমটি ফুটেছে! 'ফুটেছে! কি বেরোল?'

খালাসী বলল—'আজ্ঞে তাত বলতে পারলাম না—আপনিই দেখুন না এসে!'

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে ডঃ বসু গুদাম ঘরের দিকে গেলেন— ক্যাপ্টেন ও একদল কর্মচারী তাঁর পিছনে চলল।

দরজা খুলেই ডঃ বসু উৎসাহে চিৎকার করে উঠলেন। আর সকলে কিন্তু ভয়ে অনেকটা দূরে সরে দাঁড়ালো। ঘর জুড়ে একটা অতিকায় জানোয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে! বিশ ফুট লম্বা জিরাফের মত গলা, গা-ময় ঝাঁকড়া লোম, নাকের ডগায় একটা শিং চেহারা দেখেই ডঃ বসু বুঝলেন যে, নিশ্চয় এটা ডাইনোসরাসের বাচ্চা! আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে এখনও জ্যান্ত ডাইনোসরাস দেখতে পাওয়া যায় একথা তিনি শুনেছিলেন; কিন্তু এতবার আফ্রিকা গিয়েও কখনো স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পান নি। আনন্দে অধীর হয়ে তিনি ছোটছেলের মতন নেচে নেচে বলতে লাগলেন—'কি সৌভাগ্য আজ আমার কি শুভদিন! আসুন মশাইরা, কাছে আসুন না? নিরীহ, নিরামিষ-ভোজী জীব—কিছু বলবে না, কোন ভয় নেই। তাঁর কথায় এবং জন্তুটির ঢুলুঢুলু চোখ ও অমায়িক মুখের

ভাব দেখে ভরসা পেয়ে দু-একজন আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। ঠিক সেই মুহূর্তে ডাইনোসরাস একটু গা মোড়ামুড়ি দিয়ে তুলল। আর কোথা যায়! হুড়মুড় করে এ ওর ঘাড়ে পড়ে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। ডক্টর বসুর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে, হিড়হিড় করে তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলল। সেই যে গুদাম ঘরে তালা পড়ল, জাহাজ খিদিরপুর ডকে পৌঁছাবার আগে আর সে তালা খোলা হল না!

ডঃ বসু আদর করে ডাইনোসরাসটির নাম রাখলেন 'ভবন্দোলা' এবং আলিপুর চিড়িয়াখানার কর্তাদের টেলিগ্রাম করে দিলেন যে তিনি অতি আশ্চর্য একটি জন্তু চিড়িয়াখানায় দান করবেন— জাহাজঘাটে সেটিকে নেবার জন্য যেন লোক পাঠানো হয়। ভবন্দোলাকে ত ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে প্রকাণ্ড কপিকলে ঝুলিয়ে তীরে নামান হল। কিন্তু চিড়িয়াখানার কর্তারা তার চেহারা দেখেই, তৎক্ষণাৎ, ধন্যবাদের সঙ্গে, ডক্টর বসুর দান নিতে অস্বীকার করলেন। অগত্যা বসুমহাশয় প্রকাণ্ড এক মাল-গাড়ীতে চাপিয়ে তাকে কল্যাণীর কাছে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়িতে খুব বড় বাগান, সেখানে মস্ত চালা বেঁধে ভবন্দোলাকে রাখা হল।

মাসখানেক ঘাসপাতা খেয়ে ভবন্দোলার বিপুল দেহ দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। তখন তার পায়ে যেমন মোটা তেমনি লম্বা একটি শিকল বেঁধে তাকে চরতে দেওয়া হল। ডক্টর বসু ডাকলেই সে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাত থেকে খাবার খেতো। তার মেজাজটি বড় ঠাণ্ডা ছিল, কখনও কাউকে মারত না। দেখেশুনে ক্রমে চাকর-বাকর ও পাড়ার লোকদের অনেকটা ভয় ভেঙ্গে গেল।

একদিন এক ফোটোগ্রাফার ভবন্দোলার ছবি তুলতে এল। সেদিন তার মন ভাল ছিল না— সে মাথা গুঁজে পড়ে রইল, কোন মতেই মুখ তুলে চাইল না। ফোটোগ্রাফারের কি দুর্মতি হল, সে একটা পাথর ছুঁড়ে ভবন্দোলার নাকে মারল। অমনি ভবন্দোলা হেঁচকা টানে শিকল ছিঁড়ে, লেজের বাড়িতে চার পাঁচজনকে ভূমিসাৎ করে, এক লাফে বাগান পার হয়ে গেল, তারপর ঝড়ের বেগে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

কেঙ্গারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে, ঘণ্টায় প্রায় বিশমাইল চলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই কলকাতা যাবার বড় রাস্তায় উপস্থিত হল। সারি সারি বাস, লরি, মোটর, লোকজন রাস্তায় চলেছে, হঠাৎ ভবন্দোলাকে দেখামাত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালাল। একটা লাল টুকটুকে মোটর দেখে ভবন্দোলার ভারি পছন্দ হল, সে মোটরের পিছনে চলল। বেচারার কোনরকম দুরভিসন্ধি ছিল না, কিন্তু তার আয়তন দেখেই মোটরের আরোহীরা প্রাণপণে গাড়ী ছুটিয়ে দিল এবং হাতের কাছে যে যা পেল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল। অবশেষে ভয়ানক আওয়াজ করে যখন মোটরের টায়ার ফেটে গেল, তখন ভবন্দোলা ভয় পেয়ে রাস্তা ছেড়ে আবার মাঠের দিকে গেল।

হরিণঘাটার কাছে, মাঠের মধ্যে গাছতলায় একজন গোয়ালা গাই দুইয়ে সারি সারি বাল্‌তিভরা দুধ রেখেছে। দূর থেকে ভবন্দোলাকে দেখে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়িপানে ছুটল, গরুগুলিও বাঁধন ছিঁড়ে যে যেদিকে পারল পালাল। চোঁ-চোঁ করে কয়েক বাল্‌তি দুধ খেয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে ভবন্দোলা ধীরেসুস্থে সামনের আমবাগানে ঢুকল। ক্রমে সে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হল।

এক ভদ্রলোক ছিপ ফেলে মাছ ধরছেন, কাছেই তাঁর স্ত্রী বসে বই পড়ছেন, হঠাৎ ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উঠলেন—'ওগো, ওটা কি গো? ও-রে-বা-বা-রে!!'

'আঃ কি-যে! কথায় কথায় চেঁচাও কেন? আমবাগানে কত শেয়াল, ভোঁদড় কিম্বা বেজী—'

কথাটা শেষ না করেই ভদ্রলোক হাত-পা ছেড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন—গাছপালা চুরমার করে, ছোটখাট একটা ভূমিকম্প তুলে, তাঁর মাথার উপর দিয়ে যেন একটা পাহাড় উড়ে গিয়ে নদীতে পড়ল!

জলে নেমে ভবন্দোলার ফুর্তি দেখে কে? মনের সাধে জল তোলপাড় করে সে সাঁতার কাটতে লাগল! দূরে কতগুলি লোক স্নান করছিল, তারা ব্যাপার দেখে

চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। স্নান সেরে, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করে, ভবন্দোলা আবার বেড়াতে বেরোল।

জ্যোৎস্নারাতে একটা মাতাল রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার সঙ্গীকে বলছে—'দেখ্ আবদুল, কাল মোল্লাসাহেব আমাকে বলছে—মদ খেয়ো না, ছিঃ! আমি বললুম,— কেন মশাই, আপনার তাতে কি? সে বলে মদ বড় হারাম, ও যে খায় তাকে শয়তানে ধরে! হাঃ হাঃ হাঃ— বুড়ো হয়ে গেলাম, এখন পর্যন্ত ত শয়তানের টিকিও দেখতে পেলাম না! ভারী ভয় দেখাতে এসেছে যে শয়তানে ধরবে!'

এই বলেই সামনের দিকে চেয়ে দেখেই— 'ওরে বাবা! এই যে স্বয়ং শয়তান এসে হাজির!' হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে মাতাল বলল—'দোহাই বাবা! আমি কিছু জানি না— আমার চেয়ে ঢের বেশি পাপী ঐ আবদুল— ওকেই ধরে নাও—আমাকে কিছু বলোনা

বাবা!' মাতালের অঙ্গভঙ্গী দেখে ভবন্দোলা মনে করল লোকটা বুঝি তাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে— সে আহ্লাদে গদ্গদ হয়ে খাবারের আশায় মুখটি বাড়িয়ে দিল। শুঁতোতে আসছে মনে করে মাতাল খপ করে তার নাকের ডগার শিংটি ধরে ফেলল। অমনি ভবন্দোলা মাথা খাড়া করে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর খুব খানিক ঝুটোপুটি লেগে গেল— ভবন্দোলা যতই মাথা ঝাঁকিয়ে মাতালকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে, মাতাল ততই প্রাণপণে তার শিং আঁকড়িয়ে ঝুলে থাকে। শেষে পাগলের মত হয়ে ভবন্দোলা গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল— মাতালও শিং ছেড়ে দিয়ে, কোনমতে সাঁতরিয়ে পালিয়ে এল। সেই রাত্রেই সে মোল্লাসাহেবের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল এবং আর কখনও মদ ছোঁবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল। ততক্ষণে ভবন্দোলা আমবাগানে ঢুকে এক লম্বা ঘুম দিয়েছে।

পরদিন বিকালে জেগে উঠে খাবারের আশায় ঘুরতে ঘুরতে সে একটা বাগানবাড়িতে এসে পড়ল। বড়বড় গাছের আড়ালে থেকে সে দেখতে পেল যে বাগানে ধুমধাম করে চড়ুইভাতি হচ্ছে। হরেক রকম পোশাক পরা কত লোক, কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ বা গানবাজনা করছে! খাবার দাবার দেখেই ভবন্দোলা গাছের পিছন থেকে তার লম্বা গলাটি বার করে দিল। অমনি চেয়ার টেবিল উল্টিয়ে দুড়দাড় করে সব বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। সুযোগ বুঝে সে রাশি রাশি লুচি তরকারি মিঠাই প্রভৃতি গিলতে বসল। হঠাৎ দুড়ুম করে একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তার নাকটা চনচন করে উঠল— চমকিয়ে ফিরতেই আর একটা আওয়াজ হল, আর লেজটা ভয়ানক টনটন করে উঠল— এক ভদ্রলোক দোতলার জানলা থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে!

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গর্জন করতে করতে আবার ভবন্দোলা মাঠ-ধানক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটে চলল। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তার খেয়াল হল যে ঘুরেফিরে আবার পরিচিত জায়গাতেই সে ফিরে এসেছে!

সাধের ভবন্দোলাকে হারিয়ে বসুমহাশয়ের দুঃখ ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। দুদিন ধরে তাঁর লোকজন চারদিকে হৈচৈ করে কোন সন্ধান করতে পারেনি। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বিমর্ষভাবে তিনি জানলার ধারে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন— ঐ যে! দূরে তাঁর ভবন্দোলা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে! ব্যস্ত হয়ে তাঁর লোকজন ছুটোছুটি আরম্ভ করল। কিন্তু ভবন্দোলা আপনিই এসে শান্তভাবে নিজের খাবার জায়গায় দাঁড়ালো এবং রাশীকৃত খাবার দেখতে দেখতে শেষ করে ফেলল।

হারানিধি ফিরে পেয়ে ডক্টর বসুর আনন্দ আর ধরে না! পরদিন যখন চারদিক থেকে লোকে গালাগালি দিয়ে চিঠি লিখল ভবন্দোলা ওদের কি কি লোকসান করেছে এবং কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তখন সে আনন্দটা কিছু দমে গেল। টাকা দিতে হবে, তাবে দুঃখ নাই। কিন্তু আনাড়ি লোকে যে তাঁর সাধের ভবন্দোলা হেন নিরীব, শান্ত-শিষ্ট জন্তুর কদর বুঝল না, সেটাই হল আসল দুঃখ।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

ফেলুদা ফোটো অ্যালবাম

সন্দীপ রায়

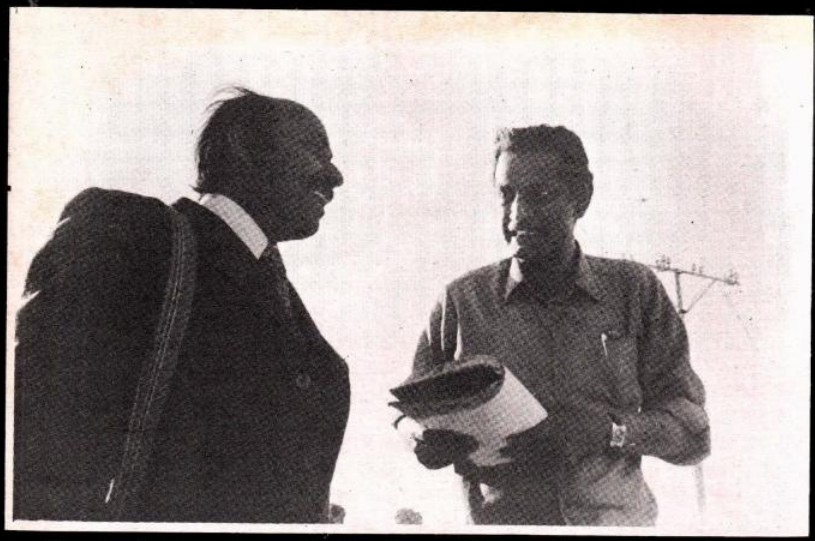

জটায়ুকে উটে চড়ার পরের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন পরিচালক। নিচে, তারই রিহার্সাল চলছে তোপ্‌সেকে নিয়ে।

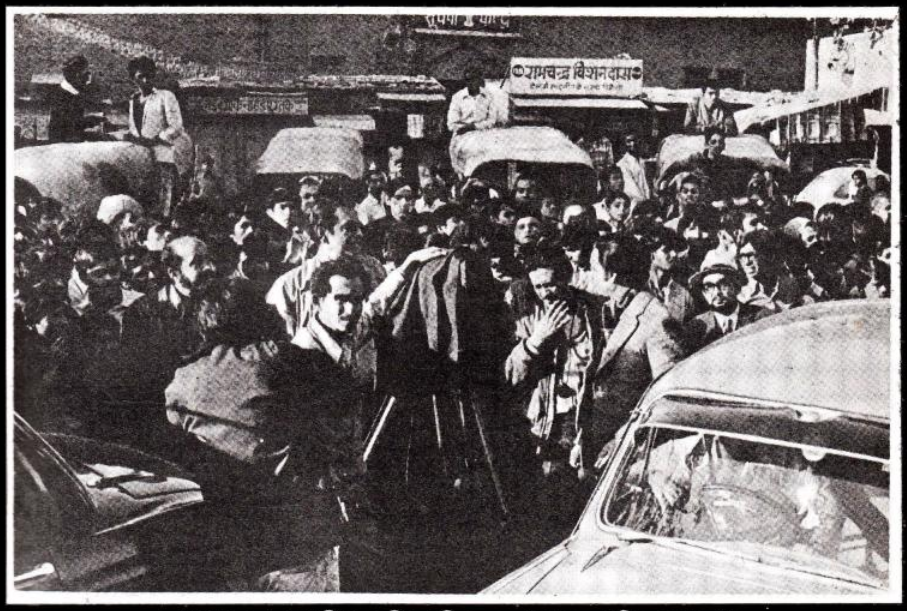

যোধপুর বাজারে শুটিং। দেখি ত ভিড়ের মধ্যে কাদের চিনতে পারো!

জয়সলমীর স্টেশনের ওয়েটিং রুমের বারান্দায় বাবা একটা শট্ কম্পোজ করছেন। পাশে ফেলুদা।

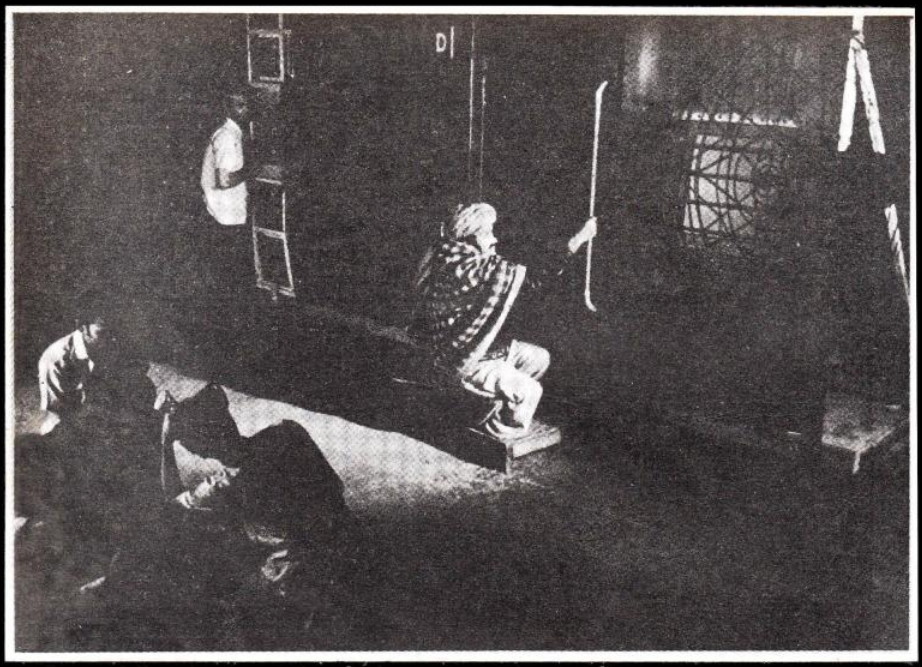

ফিল্মের ফাঁকি! 'ছুটন্ত' জয়সলমীরগামী ট্রেনের দরজার বাইরে ঘাপটি মেরে বসে আছে মন্দার বোস। নিচে, যোধপুর সার্কিট হাউসের ছাদে তিন টাক-এর সমাবেশ—সন্তোষ দত্ত, কামু মুখোপাধ্যায় ও অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা কিন্তু শুটিং-এর ছবি নয়!

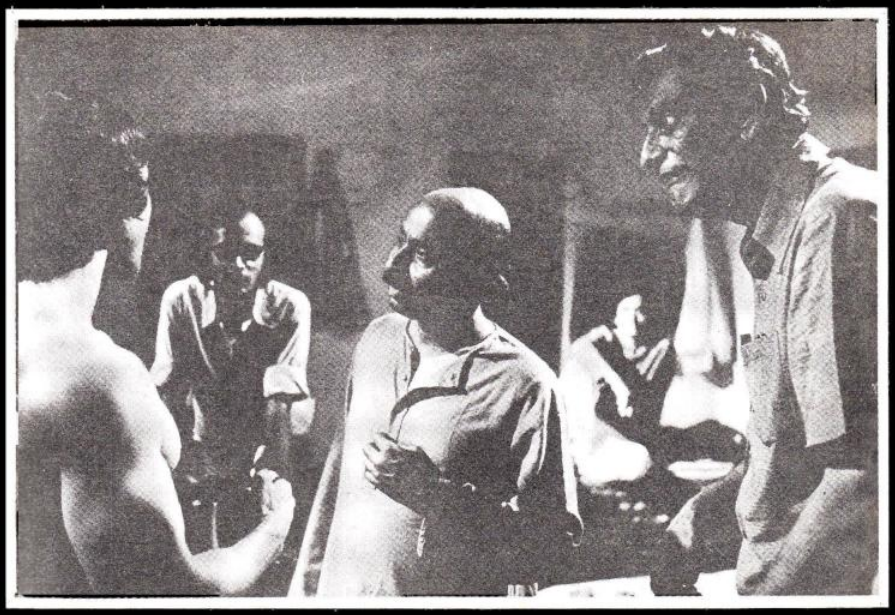

'জয় বাবা ফেলুনাথ'। বিশ্বশ্রী গুণময় (মলয় রায়) বাগচীর মাস্‌ল দেখে সন্তোষদা ও বাবা দু'জনেই থ!
নিচে, ঘোষাল-বাড়ির বৈঠকখানায় ছবির প্রধান তিন চরিত্রকে নিয়ে বাবা।

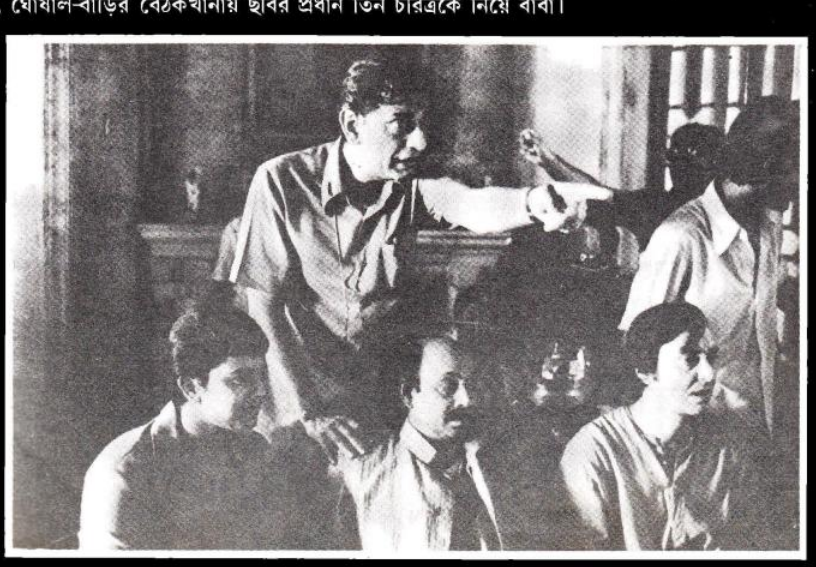

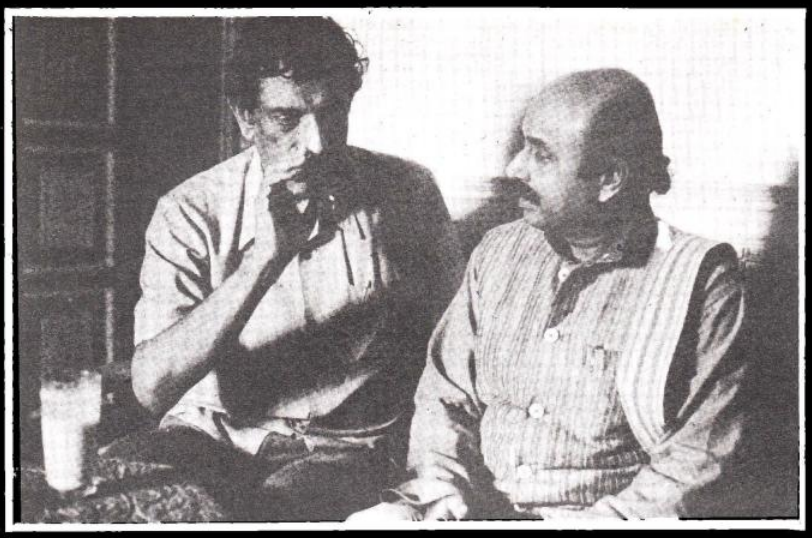

মগনলালের দেওয়া সবুজ সরবৎ কীভাবে এক চুমুকে শেষ করতে হবে, তা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিচে, নাইফ-থ্রোয়িং সীন্। বাবা ছুরি মারার জায়গাগুলো ঠিক করে নিচ্ছেন। পাশে জটায়ুর অবস্থা শোচনীয়!

মুখ থেকে নাইফ থ্রোয়িং-এর দৃশ্য শুনে উৎপল (মগনলাল মেঘরাজ) দত্ত হেসেই কুটিপাটি! পাশে দত্ত। নিচে, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তৈরি নকল দ্বারভাঙ্গা ঘাটে মছলিবাবার সভা।

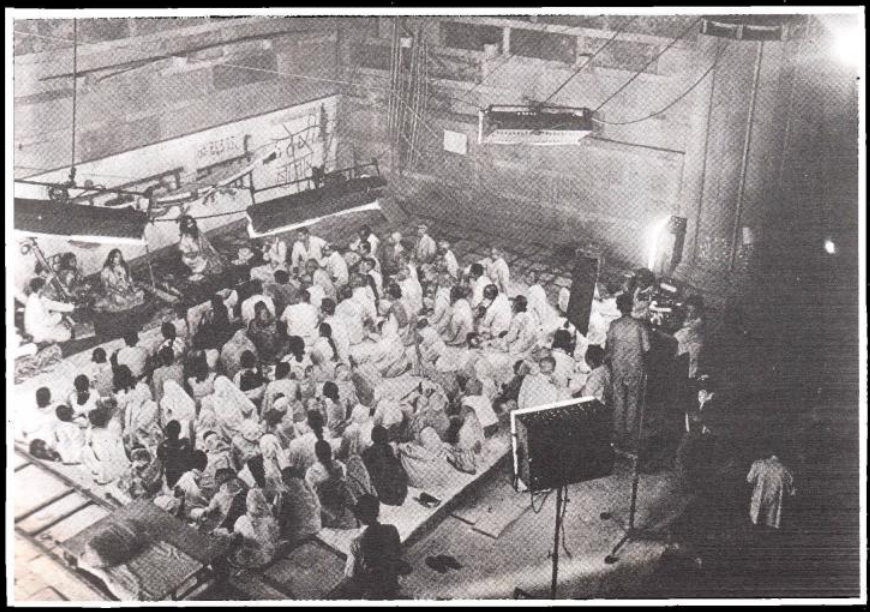

শট্-এর ঠিক আগে পটুয়া নিখোঁজ! অগত্যা বাবা-ই নেমে পড়লেন ঠাকুর রঙ করতে। আমার এক অত্যন্ত প্রিয় ছবি

বৈশাখী প্রতিযোগিতার ফলাফল

এ-বছরের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের সব ক'টা 'সন্দেশী'-প্রতিযোগিতার ফলাফল তৈরি। এবারে প্রকাশিত হলো দু-দুটো বৈশাখী প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং পুরস্কার পাওয়া সাতটা লেখা। শর্মিলা মুখোপাধ্যায় স্মৃতি প্রতিযোগিতায় তোমরা দিব্যি মালকোচা মেরে চমৎকার সব 'মারামারি'র পদ্য লিখেছ! অবিশ্যি ক-বিভাগের পুরস্কার পাওয়া দুটো লেখাতেই মিল ও ছন্দের একটু গোলমাল আছে, নিজেরা আবৃত্তি করলেই বুঝতে পারবে। জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি প্রতিযোগিতায় 'ভরত ভদ্রের ভয়' নামে গল্পগুলো তেমনি জমকালো! তবে ক-বিভাগে স্রেফ একটা, খ-বিভাগে দুটো পুরস্কার দেওয়া হলো—হ্যাঁ-গা, তিনটে করে পুরস্কার দিই কী করে, যথেষ্ট ভালো লেখা না পেলে? তাই পুরস্কার-প্রাপকদের টাকার অঙ্ক বেড়ে গেল!

মারামারি প্রতিযোগিতা

ক-বিভাগ

প্রথম (৫০ টাকা) ॥ ২৪৬ কৃষ্ণ অন্তনা দেব

দ্বিতীয় (২৫ টাকা) ॥ ২২২৭ কৌস্তুভ দত্ত

খ-বিভাগ

প্রথম (৫০ টাকা) ॥ ১৩৩৭ রাকা দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় (২৫ টাকা) ॥ ১৪১৭ দীপাঞ্জন রায়

'ভরত ভদ্রের ভয়' প্রতিযোগিতা

ক-বিভাগ

প্রথম (১৫০ টাকা) ॥ ২২০২ অস্মিতা সরকার

খ-বিভাগ

প্রথম (৯০ টাকা) ॥ ১৩৩৭ রাকা দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় (৬০ টাকা) ॥ ১৫৯৫ শাহেদ রিয়াজ

পুরস্কার না পেলেও ভালো লেখা : ৩০৮১ সুমিত সুরাই

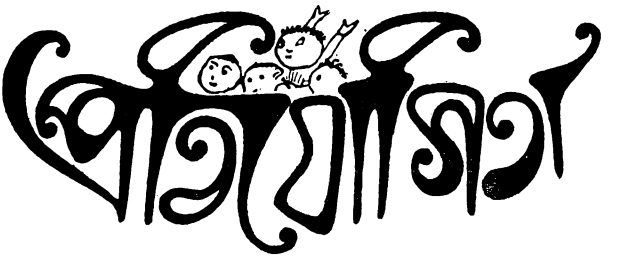

পুরস্কার পাওয়া লেখা

মারামারি প্রতিযোগিতা

মার শুধু ব্যথা দেয়? মার শুধু নির্মম?
রকমারি মারও আছে—উত্তম-মধ্যম।
নমুনা তাহারই কিছু লিখে দিই পদ্যে,
বারো 'মার' আছে বারো লাইনের মধ্যে!

ব্যথা যখন লাগেই না, তখন দেখাও না বারোটা মার আরও ১২ লাইন জুড়ে!

১

কৃষ্ণ অন্তনা দেব

গ্রাহক সংখ্যা ২৪৬। ১১ বছর ৯ মাস

চাল মেরে পথ চলে, কত লোক কে জানে
আর কেউ ডাঁট মারে, মানে আর না-মানে।
টিক্ মারা সোজা কাজ, কলমটা বাগিয়ে
দৌড় মারো আরো জোরে, যাবে ঠিক আগিয়ে।

গুল যদি মারো তবে, মেরো ভাই চুটিয়ে—
টান মারো সুতো ধরে, নাও সুতো গুটিয়ে।
তালি-মারা জামা গায়ে কেউ পথ চলে
উঁকি মারা ভালো নয়—সবাই তা বলে।

গুরু মারা বিদ্যেটা, মোটেই তো ভালো নয়
লাফ মারো খুশিতে, খবরটা ভালো হয়।
গুড়ি মেরে হেঁটো নাকো, শেখো জোরে হাঁটতে
ইয়ার্কি মারতে আমি বসিনি তো লিখতে।

২

কৌস্তুভ দত্ত

গ্রাহক সংখ্যা ২২২৭। ৮ বছর ১০ মাস

গোঁজ মারা কবিতার এই হলো শুরু—
তালিমারা ছাতা নিয়ে চলেছেন গুরু,
ছাপমারা জামা গায়ে পিছনেতে চেলা—
পকেট মারাই তার রোজকার খেলা।

ওস্তাদ মারে চাঁটি, তবলাটা পেলে—
আড্ডাটা মারা জমে, দূরে কোথা গেলে!
বাইরে তো যাওয়া বাদ হাঁচি মার হলে,
মাছি মারা বলে লোকে কাজ নাহি পেলে।

চক্কর মারে ঘুড়ি আকাশের কোলে,
চিল এসে ছোঁ মারে ভালো কিছু পেলে।
ডুব মারে কোলা ব্যাঙ পুকুরের জলে,
মাঠে মারা যায় সব, কিছুই না হলে।

৩

রাকা দাশগুপ্ত

গ্রাহক সংখ্যা ১৩৩৭। ১২ বছর ৬ মাস

মারছি না গুল আমি, সন্দেহ রাখ্ তোর—
বাঁদর মার্কামারা, মামাতো বড়দা মোর।
টুকুনদা ভাই তার, গুরুমারা শিষ্য,
লাফ মেরে আম পেড়ে, খায় সারা গ্রীষ্ম।

গুড়ি মেরে একদিন ঢুকেছিল দু'জনায়
ঘোষেদের বাগানেতে, জাম তারা খেতে চায়।
বড় এক লাঠি নিয়ে, ডালে খোঁচা মারে যেই—
মাঠে মারা গেল সব! মালী আসে এদিকেই!

ছুট্ মেরে দুই ভায়ে পুকুরেতে মারে ডুব,
মালীকে দিয়েছে ফাঁকি, তালি মেরে হাসে খুব।
'জামের কী হবে দাদা?' ঠেলা মেরে বলে ভাই,
কান ধরে টান মেরে দাদা বলে, 'আরও চাই?'

৪

দীপাঞ্জন রায়

গ্রাহক সংখ্যা ১৪১৭। ১৪ বছর

তালি মেরে মজা মার হেসে মরে খোকাটি
উঁকি মেরে দেখে—গুড়ি মারে শুঁয়োপোকাটি।
ইয়ার্কি মেরে হাবু, গুল্ মেরে মারে চোখ্—
দড়ি-টানাটানি খেলে—টান মার কি বা রোখ্।

গরীবের ভাত মেরে, মারে চাল মহাজন,
তেল মারে তাহাদের—আছে কিছু গুণীজন।
ভীড়ে কেহ তুড়ি মেরে পকেটটি করে মার,
কেহ কেহ ধরা পড়ে—ছুট্ মারে দুদ্দাড়।

ঝোপ বুঝে কোপ্ মারে, সোজা বলে মারে চার!
কথার মারেতে 'মার', গোটা তিন শোনো আর—
ধুলো মেরে চোখে, হায়, বলি শোনো কষ্টে—
স্ট্যাম্প্ মারা 'সন্দেশ'ও মার যায় পোস্টে!

'ভরত ভদ্রের ভয়' প্রতিযোগিতা

তেলেভাজা খেয়ে ঠোঙাটা ফেলার আগে ঠোঙাটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন কানুবাবু। আরে, এ যে একটা জমকালো গল্পের পাতা দিয়ে বানানো! গল্পের নামটা পড়া যাচ্ছে : 'ভরত ভদ্রের ভয়'। আর মাঝে দুটো লাইন শুধু পাঠযোগ্য—'বৃদ্ধ উঠে দরজা খুলতেই দেখলেন, একজন লোক দাঁড়িয়ে। লোকটার চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।'

কিন্তু হায়! তার আগে-পরে সব ক'টা লাইনই তেলে একেবারে জবজবে হয়ে, পড়ার অযোগ্য হয়ে গিয়েছে! তাতে কী হয়েছে? 'সন্দেশী'-বন্ধুরা একটা গল্প খাড়া করে দিতে পারবে, এ কথা তাঁকে বললে তিনি আপসোস বন্ধ করলেন। দেখো তো, চেষ্টা করে। তোমাদের লেখা তাঁকে পড়িয়ে শান্ত করব।

ভরত ভদ্রের ভয়

১

অস্মিতা সরকার

গ্রাহক সংখ্যা ২২০২। ১১ বছর ৬ মাস

ভরত ভদ্র ভারি সাদামাটা এক বৃদ্ধ। কলেজ স্ট্রিটে একটা বইয়ের দোকান তাঁর। ঘর ভাড়া করে কাছাকাছি ই থাকেন। সকালে বাজার করে নিজেই রান্না করেন। তারপর দোকানে যান। রাতে ফিরে আবার যা-হোক ফুটিয়ে খান। বিয়ে-থা করেননি। দেশের বাড়িতে বিধবা দিদি ও তাঁর ছেলে আছে। মাসে মাসে টাকা পাঠান ভরতবাবু। ভালোমানুষ ভরতবাবুর ভারি ভূতের ভয়। রাত্রিবেলা বেজায় ভয় পান। পুরনো বাড়ির ঘুপ্‌চি ঘরে তিনি যেন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পান। এই ভয় নিয়েই এতদিন কাটালেন!

একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেছে। সেদিন ভরতবাবু তাড়াতাড়ি দোকান থেকে ফিরেছেন। স্টোভ থেকে সবে ভাত নামিয়েছেন, এমন সময় দরজার কড়ার শব্দ। তিনি যেমন অবাক হলেন, তেমনি ভয়ও পেলুন। এমন সময় কে আসবে? দোকান থেকে কোনও দুঃসংবাদ আসেনি তো?

বৃদ্ধ উঠে দরজা খুলতেই দেখলেন, একজন লোক দাঁড়িয়ে। লোকটার চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ভরতবাবু চমকে উঠলেন! তাঁর দোকানের কেউ নয়। লোকটার হাতে একটা পুঁটলি। কেমন ভীতু ভীতু চেহারা।

লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'দরকারী কথা আছে। আজকের রাতটা থাকতে দেবেন?'

ভরতবাবু ভয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। কোনোমতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?'

লোকটা বলল, 'সব বলব। ভিতরে ঢুকতে দিন। দেখছেন তো এক্কেবারে ভিজে গেছি!'

ভরতবাবু দেখলেন লোকটা সত্যিই ভিজে গেছে। মনে হয় চোর ডাকাত নয়। ভূত হলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু ভূতের এমন ভীতু ভীতু মুখ হয়? তিনি লোকটাকে ঢুকতে দিলেন।

লোকটা ঢুকে বলল, 'আমাকে চিনতে পারলেন না ভরতদা?'

ভূত দেখার মতোই চমকে উঠে ভরতবাবু বললেন, 'আরে, তুমি পরেশ না?'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল তাঁর দোকানের কাছেই একটা কাপড়ের দোকান ছিল। তার মালিকের নাম অনিমেষবাবু। ভরতবাবুর সঙ্গে তাঁর ভালোই আলাপ ছিল। অনিমেষবাবুর দোকানে কাজ করত পরেশ। তিনি পরেশকে খুব বিশ্বাস করতেন। একদিন ব্যাঙ্ক থেকে দু'লাখ টাকা আনবার দায়িত্ব পায় পরেশ। পরেশ আর ফেরেনি। টাকাটা নিয়ে পালিয়ে গেছিল। অনিমেষবাবু খুব ভেঙে পড়েছিলেন। দোকান প্রায় বিক্রি হওয়ার মুখে তিনি আত্মহত্যা করেন। তারপর ওঁর পরিবারের কথা ভরতবাবু আর কিছু জানেন না।

ভরতবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'রাতে খাবে তো?'

হঠাৎ লোডশেডিং হল। তিনি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পরেশের দিকে তাকালেন। পরেশ কাঁদছে।

ভরতবাবু বললেন, 'কাজটা ভালো করোনি বাবা।'

পরেশ বলল, 'জানি। এখন তার ফল ভোগ করছি। আমাকে একটুও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না উনি।'

ভরতবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'কে?'

সেই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন ঘরে তৃতীয় কেউ রয়েছে।

পরেশ বলল, 'অনিমেষবাবুর প্রেতাত্মা। উনিই আমাকে এখানে তাড়িয়ে এনেছেন। সব সময় আমার কানের কাছে বলেন, "আমার বৌ-ছেলেমেয়েরা খেতে

পাচ্ছে না পরেশ। টাকাগুলো ফেরত দে।" আমি একটু শান্তি পাই না ভরতদা। নিজে দিতে পারব না, পুলিশে ধরবে। আপনি খুব সৎ মানুষ। আপনি টাকাটা দিয়ে দিন।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দেওয়ালে কার যেন ছায়া নড়ে উঠল। ভরতবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

পরেশ ছাইয়ের মতো সাদা মুখে বলল, 'উনি এই ঘরেই আছেন। আপনি দয়া করে ওঁর স্ত্রীকে টাকাগুলো দেবেন। ওঁরা থাকেন বর্ধমানে। এই যে ঠিকানা।'

ভরতবাবু পুঁটলি নিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, পরেশ। আমি টাকাটা ঠিক পৌঁছিয়ে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা নিঃশ্বাস পড়ল—নিশ্চিন্তের। ভরতবাবুর বুক থেকেও যেন একটা পাথর নেমে গেল।

ভোরবেলা পরেশ ভরতবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। ভরতবাবুর এখন অনেক কাজ। দোকানে খবর দিতে হবে। জামাকাপড় আর কিছু জিনিসপত্র গোছাতে হবে। তিনি ঠিক করেছেন বর্ধমানে গেলে ক'দিন থেকে আসবেন।

২

রাকা দাশগুপ্ত

গ্রাহক সংখ্যা ১৩৩৭। ১২ বছর ৬ মাস

বৃদ্ধ সীতেশবাবুর বাড়িটা এ তল্লাটের একমাত্র পাকা বাড়ি। পূর্বদিকে খানিকটা দূরে মঙ্গলাতলা গ্রামের ছোট ছোট ঘর। উত্তরদিকে বিশাল মাঠ, তারপরে একটা পোড়ো জমিদারবাড়ি। সবচেয়ে কাছের স্টেশনটা জমিদারবাড়িরও পরে রজনীপুর গ্রাম ছাড়িয়ে, মঙ্গলতলা থেকে মাইল পাঁচ দূরে।

হুক্কা-হুয়া! দূরে কোথাও যেন শেয়াল ডাকল। সীতেশবাবু বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন, দেখলেন রাত অনেক হয়েছে। তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। এদিকে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। ঘরের হ্যারিকেনটা একটু কমিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ শুয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে কিসের যেন শব্দে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। হ্যারিকেনটা তখনও জ্বলছে। মনে হল, কেউ যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। বৃদ্ধ উঠে দরজা খুলতেই দেখলেন, একজন লোক দাঁড়িয়ে। লোকটার চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

'কী ব্যাপার!' সীতেশবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন।

লোকটি ভিতরে ঢুকে ধপাস্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, 'ভূত! জমিদারবাড়িতে! একটু জল দিন না।'

বৃদ্ধ জল এনে দিলেন, 'জল খেয়ে বলুন, কী হয়েছে।'

কোনোমতে জলটুকু শেষ করে, লোকটি বলতে শুরু করল—

'আমার নাম ভরত ভদ্র। আমি থাকি মঙ্গলতলার পরের গ্রাম উজানডাঙায়। ক'দিন আগে একটা কাজে আমি শহরে গিয়েছিলাম, আজ ফিরছি। ট্রেন খুব লেট ছিল, সন্ধ্যা সাতটার জায়গায় রাত এগারোটায় স্টেশনে নামলাম।

যাহোক, আমি বাড়ির পথে হাঁটতে লাগলাম। অত রাতে রাস্তায় লোকজন ছিল না। যখন রজনীপুর ছাড়িয়ে এলাম, তখন বড্ড ক্লান্ত লাগছে। ভাবলাম—কাছাকাছি কোনো ঘরবাড়ি দেখলে আশ্রয় নেব। কিন্তু রজনীপুরের কাছাকাছি এক ওই জমিদারবাড়িটাই রয়েছে।

আমি যখন জমিদারবাড়ির সামনে পৌঁছলাম, তখন খুব ঘুম পেয়েছে। ও বাড়িতে এখন তো কেউ থাকে না, ভাবলাম রাতটা ওখানেই নিশ্চিন্তে কাটাব। তবে কেন জানি না, বিশাল বাড়িটায় ঢুকতে ভয় করল। তাই বাড়িটার পাশে যে একটা ভাঙাচোরা পুরনো মন্দির রয়েছে, সেটায় ঢুকে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙে গেল। জমিদারবাড়ির ভিতর থেকে কার যেন নূপুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা মোটা গলার অট্টহাসি। উঃ! কী বীভৎস!'

ভরত একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে মাঠ পেরিয়ে আপনার এখানে এলাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অনেক

আগে ওই বাড়িতেই পান্নাবাঈ নামে এক নর্তকীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। নির্ঘাৎ তারই ভূত! বাপ্ রে, আজ খুব জোর বেঁচে গিয়েছি!'

সীতেশবাবু পাশের ঘরে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বললেন, 'বাকি রাতটা এখানেই থাকুন, কাল খোঁজ নেওয়া যাবে।'

ভরত কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দিল।

পরের দিন সাতসকালে ভরত উঠে পড়ল। এই ভূতুড়ে জায়গায় সে আর একমুহূর্তও থাকবে না। বৃদ্ধ তখনও ঘুমাচ্ছেন, তাঁকে না-ডেকেই ভরত বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর গিয়ে ভরত দেখল, একটা চায়ের দোকানে ভীষণ ভিড়। সবারই বেশ শহুরে চেহারা। ভরতকে দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'আসানসোল যাবার ট্রেন কখন আসে, জানেন কি? কেউ বলতে পারছে না!'

'তা ঠিক জানি না তো।' একটু অবাক হল সে, 'আপনি বুঝি এ গ্রামে নতুন?'

'হ্যাঁ, সিনেমার শুটিং করতে এসেছি।' ভদ্রলোক বললেন।

ভরত আরও অবাক, 'সিনেমা! এখানে! এদিকে তো লোকজন কম, বিদ্যুৎও আসেনি।'

'তাতে একটু মুশকিল হয়েছে ঠিকই। কালকে আবার জেনারেটারটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে কালকেই এখানকার শুটিং সেরে আজকে ফেরার কথা। শেষে বহু কষ্টে ওটা সারিয়ে, রাত বারোটার পর শুটিং করেছি।' ভদ্রলোক একটু হেসে জবাব দিলেন।

'তা আপনাদের শুটিং কোথায় করলেন?'

'ওই জমিদারবাড়িতে। ঐতিহাসিক সিনেমা কিনা। নাম 'পান্নাবাঈ'। দারুণ হিট্ হবে, দেখবেন। আচ্ছা, চলি।'

ভরত কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাসিতে ফেটে পড়ল।

৩

শাহেদ রিয়াজ

গ্রাহক সংখ্যা ১৫৯৫। ১৬ বছর

ভরত ভদ্রও ভয় পায়!

বিশ্বাস হল না তো? না হওয়ারই কথা। আমি বুদ্ধিমান, সেটাও তো তুমি বিশ্বাস করতে না। কী বললে? এখনও করো না? তাহলে বরং তোমাকে ভরতের ভয় পাওয়ার ঘটনাটা বলা যাক্। মন দিয়ে শোনো।

জানো নিশ্চয়ই, মেছোবাজারের নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে রোজ বিকেলে আড্ডা বসে। সেই আড্ডায় যাওয়ার প্রথমদিন ভরত ভদ্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেদিন আলোচনা চলছিল কলকাতায় বাস-ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে। সকলেই এর নিন্দে করছিলেন। ব্যতিক্রম ভরত। সে ভাড়া বৃদ্ধির প্রশংসা করছিল। আমি ঘাবড়ে গেলাম। একটু খুশিও হলাম। বেশ খরচে মনে হচ্ছে লোকটা। ঘাড় ভেঙে খাওয়া যাবে। কিন্তু অচিরেই ভরত আমার ভুল ভেঙে দিল। ওর বক্তব্য—মেছোবাজার থেকে সব্জিপট্টি পায়ে হেঁটে গিয়ে, ও আগে বাঁচাত এক টাকা। এখন বাঁচাবে এক টাকা কুড়ি!

কিন্তু এ তো গেল ভরতের চরিত্রের একটা দিক। অন্য দিকটা আরও লোমহর্ষক। সেটা হল, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সাহস। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

বছরখানেক আগে ভরত একবার তার সাত বছরের ভাইঝি টেমিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল। ছোট্ট টেমি সেখানে গণ্ডার দেখে একেবারে মোহিত হয়ে পড়ে। ভরতের অজান্তে ভরতের পকেট থেকে পার্সটা হাতস্থ করে, গলিয়ে দেয় বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ভোজনরসিক গণ্ডারটিও নির্দ্বিধায় মুখে পোরে সেটা। ব্যাপারটা এতক্ষণে ভরত ভদ্রের নজরে আসে। সে কালক্ষেপ না করে টেমির সাহায্যে বেড়া ডিঙোয়। গণ্ডারের মুখ থেকে ও ছিনিয়ে নেয় পার্সটা। কিন্তু হায়! বেড়া আর টপ্‌কাতে পারে না। এখানে তো আর টেমি নেই। বদলে আছে একটা মুষকো গণ্ডার। তবে শেষপর্যন্ত

শোনা যায়—এই গণ্ডারটার কাঁধে পা রেখেই, ভরত অতিক্রম করেছিল বেড়ার বাধা!

এতদসত্ত্বেও অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় দুর্বাদলের (দুর্বাদল দত্ত) দল ভরতকে প্রায়ই ভয় দেখাবার চেষ্টা করত। এবং বলাই বাহুল্য, তাদের প্রচেষ্টা প্রতিবারই ব্যর্থ হত। এ-সব নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল সেদিন, অবশ্যই ভরতের অনুপস্থিতিতে। মহেশ মিত্র বলছিল, 'ভরত ভদ্রকে ভয় দেখাতে পারে, এমন লোক ইউনিভার্সে নেই।'

কেন জানি না, এই মহেশ মিত্র লোকটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারতাম না। তাই ফস্ করে বলে ফেললাম, 'আমি আপনাদের ভরত ভদ্রকে ভীত করতে পারি।'

শুনে মহেশ মিত্র খুব-একটা প্রীত হল না। বলল, 'কাল সকাল এগারোটার মধ্যে যদি ভয় দেখাতে পারেন, তাহলে সারা জীবন আমি আপনার অনুগত থাকব।'

রোখের মাথায় চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নিলাম বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরে রাত এগারোটা অবধি ভেবেও কোনও কূল পেলাম না। শেষে এগারোটা বেজে পাঁচে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। হাঁটতে লাগলাম ভরতের বাড়ির দিকে। আমার উদ্দেশ্য ছিল খেলার আগে পিচটা একবার দেখে নেওয়া। পিচ পছন্দ না-হলে খেলার ছক কষা, না-হলে বিপক্ষকে গট-আপের প্রস্তাব দেওয়া।

ভরত ভদ্র আমাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আমাকে বসিয়ে, ভাত খাওয়ার ছল করে কেটে পড়ল। যাওয়ার সময়, হয়তো আমার চোখের ভুল, তবু মনে হল ওর পা-দুটো কাঁপছিল।

সে যাক্, আমি বসে রইলাম। চারদিকে তাকিয়ে বুঝলাম, এই পিচে খেলা একেবারেই অসম্ভব!

এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। ভরতের আর দেখা নেই! দরজাও দেখি বন্ধ। বুঝলাম, ব্যাটা দরজা এঁটে ঘুম দিচ্ছে। আমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে! কী দুঃসহ অপমান! আমি বিরসবদনে বাড়ি ফিরলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় ব্যাজার মুখে নিকুঞ্জবাবুর নিকুঞ্জে গেলাম। আশা করেছিলাম আমি ঢোকামাত্র মহেশ, দুর্বাদল, ভবেশ্বরের বিদ্রূপ-বিকৃত মুখ থেকে প্রবল বেগে বিনির্গত হবে হাসি-ঠাট্টা-মস্করার বিশ্রী ফোয়ারা। কিন্তু তার বদলে এ কী হল! দশ জোড়া সম্ভ্রম-শঙ্কিত চোখ-মুখ সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে স্বাগত জানাল আমাকে। অনেক ভণিতা বাগাড়ম্বরের পর ভবেশ্বর আসল কথাটা বলল।

কাল রাতে প্রচণ্ড গরম পড়ায় ভবার বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই বাইরের বৈঠকখানায় শুয়েছিলেন। হঠাৎ মাঝরাতে দরজায় কে কড়া নাড়ল। বৃদ্ধ উঠে দরজা খুলতেই দেখলেন, একজন লোক দাঁড়িয়ে। লোকটার চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ভবেশ্বর লোকটাকে চিনতে পারল। ভরত ভদ্র। ভয়ের কারণ জিজ্ঞেস করাতে ও নাকি শুধু দুটো কথাই বলেছিল, 'প্রিয়নাথ! প্রিয়নাথ!'

বলাই বাহুল্য, আমিই প্রিয়নাথ পাল!

কিন্তু ভরত ভদ্র কেন আমায় সেদিন ভয় পেয়েছিল? প্রশ্নটার উত্তর তখন পাইনি। এখন পেয়েছি। কারণ, ভরত হাড়-কেপ্পন, আর আমি লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিতে দালালি করতাম!

ছবি : সত্যজিৎ রায়

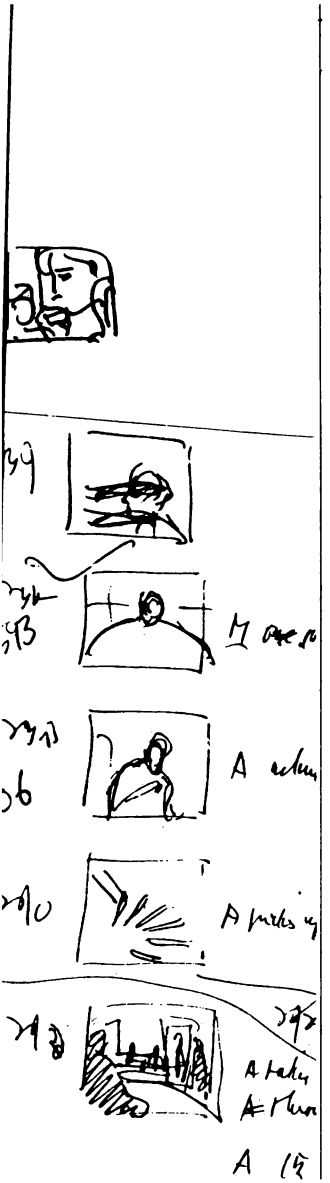

ফেলুদার সঙ্গে আড্ডা

সুজয় সোম

॥ ২ ॥

সামনে খুদে টেবিলের ওপর মস্তো পেয়ালায় লিকার-চা, ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছে ফেলুদা। লীলা মজুমদারের 'আর কোনোখানে'। অবিশ্যি ও-বইটা যে ফেলুদার বহুবার পড়া, সেটা জানি। ফেলুদা থেকে থেকেই এরকম কয়েকটা প্রিয় বইয়ের পাতা ওল্টায়, খামচে খামচে পড়ে, স্রেফ মজে যায়! আর আমি এদিকে ফেলুদার বাপের উট-পোষার গপ্‌পোটা শোনার জন্য, হা-পিত্যেশ করে বসে আছি!

ডালমুট দিয়ে আমার চা-খাওয়া কখন হয়ে গেছে! ফেলুদা কিন্তু বই পড়ার সময় হরদম সিগারেটে টান দেয়, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে বড্ড দেরি করে। উস্‌খুস্ করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—রাজস্থানের মরুভূমিতে ফেলুদার লেখা ছড়াগুলো! শুনে শুনেই দিব্যি মুখস্থ হয়ে গেছে।

(১)

শুটিং গেল ভেস্তে যখন
বাড়ি ফেরাই ভালো।
যতক্ষণে আসবে গাড়ি
থাকবে না আর আলো!

(২)

মেজাজ গেছে খিঁচ্‌ড়ে!
ট্রেনটাকে কি যায় না আনা—
টেনে কিম্বা হিঁচ্‌ড়ে?

(৩)

সকাল থেকে উটের ভয়ে ছিলাম সবাই সিঁটিয়ে!
এখন মনে হচ্ছে জ্বালা মিটিয়ে—
বরং চট্‌পট্
উটে চড়ে দিই না কেন শট্!

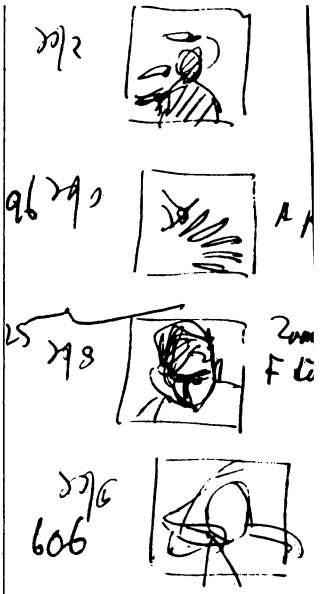

ছড়াগুলো মনে মনে আওড়াচ্ছি, ফেলুদা বলে উঠল, 'লীলুপিসির এই স্মৃতিকথার বইটা যে একটা বড় শিল্প, সেটা বইয়ের প্রথম লাইন থেকেই বোঝা যায়। শোন্—"পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ছিল আমার মায়ের বাড়িটি। দু' সারি ইঁকড়া দিয়ে গাঁথা তার দেয়াল, তার উপরে ভিতরে বাইরে চুন-বালির পলেস্তারায় চুনকাম করা। দুই সারি ইঁকড়ার মাঝখানে এক বিঘৎ ফাঁক, তার মধ্যে রাতে বড় বড় ইঁদুরদের দাপাদাপিতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যেত, কিন্তু ঐ ফাঁক রাখার জন্যই বাইরের প্রচণ্ড শীত ঘরের ভিতরে ততটা সেঁধোতে পারত না। মাথার উপরে নীল করোগেটের ছাদ, তার তলায় টান করে চুনকাম করা ক্যাম্বিসের সিলিং ; এমন সুন্দর, এমন আরামের, এমন নিরাপত্তার জায়গা এ জগতে আজ অবধি তৈরি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। যদিও একটা বড় করাত দিয়ে যে কেউ দু' সারি ইঁকড়ার দেয়াল কেটে ফেলতে পারত, তবু বিপদের যে কোনো সম্ভাবনাই ছিল না এ বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চিন্ত ছিলাম, কারণ ধারে-কাছে কোথাও বিপদের সম্ভাবনা হবামাত্র আমার মা যে তাঁর গোলাপি নখ দেওয়া ফর্সা হাত দুটি দিয়ে তাকে স্বচ্ছন্দে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, এ বিষয়ে আমাদের কারো মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।"... আহা, আমাদের সকলেরি ছোটবেলায় এরকম একটা নিরাপদ আশ্রয় না-থাকলে, মহা মুশকিল!... দুর্দান্ত! পড়েছিস বইটা?'

'থামলে কেন ফেলুদা? পড়ে যাও না।'

'এ-বইটা বুকের মধ্যে গুঁজে রাখতে হয়। মহৎ শিল্প কাকে বলে, ওরে, মনের কান পেতে শোন্।... "পাহাড়ের ঢালের উপর লম্বা একহারা বাড়ি, চারদিকে তার কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে মে-ফ্লাওয়ারের ঝোপ, বসন্তকালে তাতে থোপা থোপা সাদা ফুল ফুটে, লতানে গোলাপের ফুলের ছড়ার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে থাকে। লালচে রঙের কাঠের ফটক দিয়ে ঢুকে, ঢালু কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে নেমে ছোট একটা পাথরের পুল পার হয়ে আমাদের বাড়ির সামনের কাঠের রেলিং ঘেরা কাঠের বারান্দায় উঠতে হত।"... কী রে, কেমন লাগছে?'

'জানি তো! বাইরের বিশ্ব-প্রকৃতি আর ঘরের নিরাপত্তা, মানুষের ছেলেমেয়েদের আর কিছুর দরকার নেই। নিরাপত্তাটা অবিশ্যি মনের জিনিস। তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না।...তারপর?'

'তারপর... "ব্যস, আর কোনো ভয় নেই। বারান্দার ছাদের কড়ি থেকে ঝুলে থাকত তারে বাঁধা সরলগাছের ছালসুদ্ধ সরু ডালের তৈরি অনেকগুলি চারকোণা

ঝোড়া, তাতে অর্কিড ফুলের বাহার দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। যেন মোমের তৈরি ফুল ; কি তাদের রঙ, ফিকে বেগ্‌নি, হলদে, সাদা, খয়েরি ফুটকি, ঘোর বাদামি ডোরা-কাটা, স্বর্গের ফুল সব, তার ভুরভুরে গন্ধ ধূপ-ধূনো মসলার কথা মনে করিয়ে দিত। এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্নে সে গন্ধ পাই।"... জানিস, ওই রোমাঞ্চকর গন্ধটা স্বপ্নের মধ্যে আমিও টের পাই। শিলং পাহাড়ে লীলুপিসিদের ওই নীল করোগেটের ছাদ দিয়ে ঢাকা নিরাপদ বাড়িটার নাম ছিল 'হাই-উইন্ডস্'। সেই তীক্ষ্ণ বাতাস আমার মনেও ঢেউ তোলে!'

'তোমার কি গলার নীচের পানিফলের মতো জায়গাটায় ব্যথা করছে?'

কেমন যেন উদাসভাবে বইটা বন্ধ করে পাশে রাখল ফেলুদা। একেবারে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া লিকার-চায়ে শেষ চুমুক দিলো। তারপর পশ্চিমি ঢ্যাঙা সিগারেট ধরিয়ে, এক-মুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমাকে থিয়েটারে পাকিয়েছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সিনেমা কাকে বলে জেনেছি সত্যজিৎ রায়ের কাছে। কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবীতে টইটম্বুর বেঁচে থাকার ঢঙ, সেই তাগিদটা বানিয়ে দিয়েছেন কয়েকজন চিরকেলে সাহিত্যিক! মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ থেকে লীলা মজুমদার। শুধু মানিকদাকে নয়, আমার শিল্পীসত্তাকেও দারুণভাবে উস্‌কেছেন লীলুপিসি! অবিশ্যি আমার জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ বা কার্ল মার্ক্স-এর প্রভাবও অনেকখানি।'

'ও হ্যাঁ, 'আর কোনোখানে' বইটা যে ইংরিজিতে অনুবাদ হচ্ছে, সেটা জানো?'

'তাই নাকি? দারুণ খবর!' হৈহৈ করে উঠল ফেলুদা, 'অনুবাদ কে করছেন?'

'লীলা মজুমদার নিজেই।'

'চমৎকার! গোটা দুনিয়া আমাদের চিনুক।... জানিস, আমার বাবা ও লীলুপিসি একসঙ্গে এম. এ ক্লাসে পড়তেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই থেকে দু'জনের প্রাণের বন্ধুত্ব! আমিও তাই ছোটবেলা থেকে লীলুপিসির সঙ্গে এন্তার মেলামেশা করতে পেরেছি। এখন ৮৮ বছর বয়েসেও... আহা, সারাক্ষণ রসে টইটম্বুর একজন আশ্চর্য মানুষ! লীলা মজুমদার হলেন আবহমান ভারতীয় সভ্যতার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষা!'

'জানো ফেলুদা, আমি তো কখনও 'হাই-উইন্ডস্' বলে বাড়িটায় যাইনি, কিন্তু 'আর কোনোখানে' বইটা যখনি পড়তে শুরু করি, ওই বাড়িটা আমাকে পেয়ে বসে! খুব ছোটবেলা থেকেই এটা হয়। কিছুতেই ছাড়ান পাই না! শিলং পাহাড়ের ওই স্বপ্নের বাড়িটায় সটাং চলে যেতে ইচ্ছে করে!'

'আশ্চর্য! আমারো এটা হয়!'

কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল ফেলুদা। সিগারেটে জমে-ওঠা একটা লম্বা ছাই টুপ্ করে খসে পড়ল মেজেতে।

'এই যে তুমি আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলে, শুনতে শুনতে...বুকের কাছটায় ব্যথা করছিল! গলা শুকিয়ে আসছিল!'

ফেলুদা কোনও কথা না-বলে, আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'কেন এমন হয় বলো তো?'

'জিভটা তেতো তেতো লাগছে!' আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে ফেলুদা বলল, 'ওরে, মহৎ শিল্প এভাবেই আমাদের নাড়িয়ে দেয়। আমাদের সজাগ করে তোলে। শুধু সাহিত্যে কেন, পেন্টিং বা সিনেমা দেখেও এটা হয়! মানিকদার 'জলসাঘর' ছবিতে জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ওই খাঁ-খাঁ বাড়িটা, ওই জলসাঘর... আজও আমাকে তাড়া করে বেড়ায়! তেম্‌নি 'অপরাজিত' ছবির সর্বজয়াকে... অমন একজন মা-কে... কিছুতেই ভুলতে পারি না! 'আগন্তুক' ছবির মনমোহন মিত্তির আমার বুকের মধ্যে এম্‌নি গেড়ে বসলেন, বারে বারে ছবিটা দেখতে বসে মনে হয়—যাই, গড়ের মাঠে মামাবাবুর পাঠশালায় ঢুকে পড়ি!'

'আচ্ছা, জল-রঙে আঁকা সুকুমার রায়ের সেই সূর্যাস্তে গঙ্গার ছবিটা কখনও দেখেছ?'

'ও ছবিটা তো মানিকদা সিনেমায় দেখিয়েছেন। 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রে। ছবিটা...'

'আমি না ওরিজিনাল পেন্টিংটা দেখেছি, ফেলুদা। অসুস্থ সুকুমার রায় তখন হাওয়া বদলাতে সোদপুরের গঙ্গার ধারে একটা বাড়িতে বাস করছেন, প্রায় মৃত্যুশয্যায় ছবিটা আঁকা! ১৫-১৬ বছর আগে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে ছবিটা দেখতে দেখতে...কেমন যেন অবশ হয়ে গেছিলাম! তির্‌-তির্‌ করে ফুরিয়ে যাওয়া সোদপুরের সেই বিকেলে, আমিও যেন ওই গঙ্গার ধারে বসে আছি। বড় সুন্দর এই পৃথিবীতে আরও একটা চমৎকার দিন...এক্ষুনি টুপ্‌ করে খসে যাবে আমার জীবন থেকে! বুকটা হু-হু করে কেঁদে উঠল।... জানো, অমন বিষণ্ণ পেন্টিং আর-কখনও দেখিনি!'

'বড় মাপের শিল্প-সাহিত্য এভাবেই আমাদের ধাক্কা দেয়। আমাদের অনুভূতিকে উস্‌কে দেয়। হয়তো গঙ্গায় সূর্যাস্তের ওই ছবিটা তোকে আরও বে-পরোয়াভাবে বাঁচতে শেখাল। আমাদের জীবনে প্রতিটা মুহূর্তই যে কত দামি, এই অনুভূতিটা হয়তো তোর ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিলো!'

ফেলুদা ডালমুটের থালায় হাত বাড়াল। আর তখুনি আমার মনে পড়ে গেল 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিটার কথা। বললাম, 'পালামৌর জঙ্গলে সেই যে নানারকম মানুষের নানারকম অনুভূতি—'

আমাকে বাধা দিয়ে ফেলুদা বলল, 'তুই 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিটার কথা ভাবছিস? আমার অতি প্রিয় ছবি। মানিকদারও...'

'জানি তো। একদিকে যেমন ও-ছবির নানারকম মানুষ, অন্যদিকে পালামৌর জঙ্গলের যে প্রাকৃতিক রূপ, ঘরবাড়ি... সব মিলিয়ে যে অপার্থিব সৌন্দর্য, ২৫ বছরেও সেই মায়া কাটাতে পারলাম না!'

'খাঁটি শিল্পের মজাটা তো এখানেই!'

'তোমরা চার বন্ধু যে বাংলোটায় উঠেছিলে, কিম্বা সেই কুয়োতলায় চান,

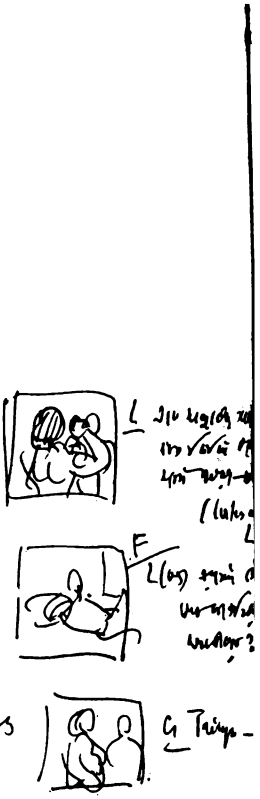

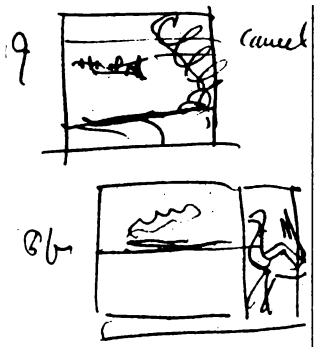

নতুন বান্ধবীকে নিয়ে তুমি খুদে সাঁকো পেরোচ্ছ, সেই বান্ধবীর মনের নিবাস যে ঘরটায়, কিম্বা মেলার মাঠে তোমরা টইটই করে ঘুরে বেড়াচ্ছ...'

'ওরে, সত্যি যে কোথায় শেষ হয়, আর স্বপ্ন যে কোথায় শুরু হয়, বলা মুশকিল!' আলতো হেসে ফেলুদা বলল, 'আবার লীলুপিসিকে কোট্ করলাম!'

'কথাটা ঝগড়ু বলেছিল। 'হল্‌দে পাখির পালক' উপন্যাসে।'

'মোট কথা, শিল্পের রাজ্যে সত্যি-মিথ্যে বলে কিছু নেই!'

'জানো, 'সোনার কেল্লা' ছবিটা এন্তার দেখে দেখে, রাজস্থানের মরুভূমি... আমার স্বপ্ন আর বাস্তবে ঘেঁটে গেছে! থেকে থেকেই আমিও যেন তোমাদের মতো উটে চেপে ছুটতে ছুটতে...ওরকমি রুমাল নেড়ে—কোথায় যেন যাবার তাড়া আছে—একটা ট্রেন থামাতে চেষ্টা করছি। সাদা ও ছাই-রঙা টুকরো টুকরো মেঘে আকাশ ভরে আছে। তারি ফাঁক দিয়ে সোনালি রোদ হুমড়ি খেয়েছে মরুভূমির ওপর। ওমা, ট্রেনটা মরুভূমির সেই ঝল্‌মলে আকাশে মিশকালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পালিয়ে গেল! একেবারে পগার পার!... ও হ্যাঁ, তোমার বাবার উট-পোষার গপ্‌পোটা বললে না?'

একপেশে হাসি হেসে ফেলুদা বলল, 'ওটা তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। আপিসের কাজে বাবা কিছুদিন রাজস্থানে বাস করেছেন। জয়পুরের কাছে সাম্বার বলে একটা জায়গায়। তখনই উট পুষতেন। স্রেফ ঘুরে বেড়াবার জন্য। আর আমরাও দিব্যি উটের পিঠে চেপে...এমনকি ধূ-ধূ মরুভূমিতেও দিন-রাত চক্কর মেরে, নতুন একটা পৃথিবীকে চিনতে শিখলাম! ওরে, মন্দার বোস যতই আমার নিন্দেমন্দ করে বেড়াক, উটে চাপতে ভয় পাবো কেন, ছ্যা-ছ্যা! মনে রাখিস, আমরা ফেলু-তোপ্‌সে দু'জনেই স্মার্ট, দু'জনেরি ব্যায়াম-করা ছিমছাম শরীর।'

'ওদিকে লালমোহনবাবু তো মরুভূমিতে উটের পিঠে চাপার স্বপ্ন দেখতেন ছোটবেলা থেকে। সেই স্বপ্ন যখন বেমক্কা ফলে গেল, জ্যান্ত উটের সামনে দাঁড়িয়ে, অ্যাদ্দিনের স্বপ্ন স্রেফ বিভীষিকা হয়ে উঠল! যা নড়বড়ে জানোয়ার, হাঁটাহাঁটির সময় যা দোল-দোলানি, বাপ্ রে, এ-ব্যাটার পিঠে চড়লে নির্ঘাৎ...'

'না-না, লালমোহনবাবু মোটেই উটের ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলেন না। সবটাই সন্তোষ দত্তের দুর্দান্ত অভিনয়! বলেছি তো, উট এপিসোডটাই ছিল আমাদের কাছে দারুণ মজার একটা ব্যাপার।'

'সত্যি, কী অদ্ভুৎ জানোয়ার রে বাবা! নেশাখোরের মতো আধ-বোজা ঘোলাটে চোখ, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো কোদালের মতো দাঁত, ঝোলা ঠোঁট উল্টিয়ে দিন-রাত কী জানি চিবোচ্ছে! উটের পিঠে ওঠার সময় তো...'

হো-হো করে হেসে উঠল ফেলুদা।

'উটে চড়ার কায়দাটা শিখে গেলে দেখবি, ব্যাপারটা দারুণ মজার। ভড়্‌কে যাবার কোনও স্কোপ নেই!'

'তুমি ওই ছড়া তিনটে কখন লিখেছিলে?'

'সে এক কাণ্ড! লাঠি স্টেশন আর চান্দনির মধ্যে একটা জায়গায় উটের

দৃশ্যের লোকেশন বাছা হয়েছিল। জায়গাটা জয়সলমিরের প্রায় ৭০ মাইল পূবে, যোধপুরের দিকে। কোনও নাম নেই জায়গাটার, লোকালয় থেকে ঢের দূরে। চারদিকে ধূ-ধূ মরুভূমি। সেই অফুরন্ত বালির রাজ্যে মাঝে মাঝে শুক্‌নো ঘাস আর ছোট ছোট কাঁটা-ঝোপ। তারি মধ্যিখানে মিটার গেজ লাইন—যার কোনও শুরু নেই, শেষও নেই! সেই রেল-লাইনের পাশ দিয়ে জয়সলমির যাবার পিচের রাস্তা। সেই রাস্তায় একটা গাড়িতে লালমোহনবাবু আর তোপ্‌সেকে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি, আমাদের ট্রেনের কোনও পাত্তা নেই! মাঝে মাঝে মোটরগাড়ি থেকে নেবে রাস্তায় পায়চারি করছি, রসের গল্প-গুজব চলছে, সিগারেট ফুঁকছি।'

'কোন্‌ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলে তোমরা?'

'হয়েছে কি, মানিকদা ইউনিট নিয়ে পোকরানে শুটিং করতে গেছেন। আমাদের ছবির জন্য আস্তো একটা ট্রেন নিয়ে ফেরার কথা!'

'আস্তো ট্রেন!'

'হ্যাঁ, ট্রেনটা থাকবে আমাদের মুঠোয়। আমরা সেটা দরকার মতো কাজে লাগাব। ট্রেনটাতে থাকবে ফার্স্ট ক্লাস ও থার্ড ক্লাস মেশানো ছ'টা বোগি, গার্ডের গাড়ি, কয়লার গাড়ি ও এঞ্জিন।'

'খরচাপাতি?'

'আমাদের শুটিং-এর জন্য ট্রেনটা চালাতে যা কয়লা লাগবে, তার খরচ দেবো আমরা, ব্যস! পোকরান থেকে আমাদের উট-পর্বের লোকেশনে আসার পথে, মানিকদা ট্রেনের কামরায় শুটিং করবেন মুকুল আর অমিয়নাথ বর্মনকে নিয়ে।'

'বর্মন তখন তো নকল ডাঃ হাজরা!'

'হ্যাঁ, নকল ডাঃ হাজরা মুকুলকে নিয়ে জয়সলমির যাবার পথে ঝিমিয়ে পড়েছে, আর মুকুল তন্ময় হয়ে—'

'জানলা দিয়ে মুকুল তখন বাইরের দৃশ্য দেখছে, তাই তো?'

'ওই দৃশ্যটা, আর কয়লার গাড়িতে উঠে রেল-লাইন ও এঞ্জিনের কিছু শট্‌ তুলে, আস্তো ট্রেনটাকে নিয়ে আমাদের কাছে ফেরার কথা মানিকদার। আমরা হা-পিত্যেশ বসে আছি, মানিকদাদের পাত্তা নেই! ওদিকে ভাড়া-করা উটগুলো সিনেমায় পার্ট করবে বলে সেজে-গুজে রেডি। কিন্তু শুটিং শুরু হচ্ছে না, উটেরাও মহা বিরক্ত!'

'আহা, জাজিম ঝালর গয়নাগাটি দিয়ে, কী বাহারি সাজ উটেদের! গলাটাও রঙচঙে চাদর দিয়ে ঢাকা। তাতে আবার কড়ি দিয়ে কাজ করা। বেড়ে দেখায় কিন্তু!'

হৈহৈ করে উঠল ফেলুদা, 'ও-সব পরে-টরে উটের দল যখন সেই রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশে, ধূ-ধূ বালির ওপর দিয়ে সার বেঁধে চলে...'

'উটগুলো সব পেলে কোথায়?'

'আমাদের ওই লোকেশন থেকে সাত মাইল পূবে, খাচি বলে একটা গ্রাম থেকে উটের দলটা এসেছিল। উট জিনিসটার কোনও অভাব নেই রাজস্থানে।

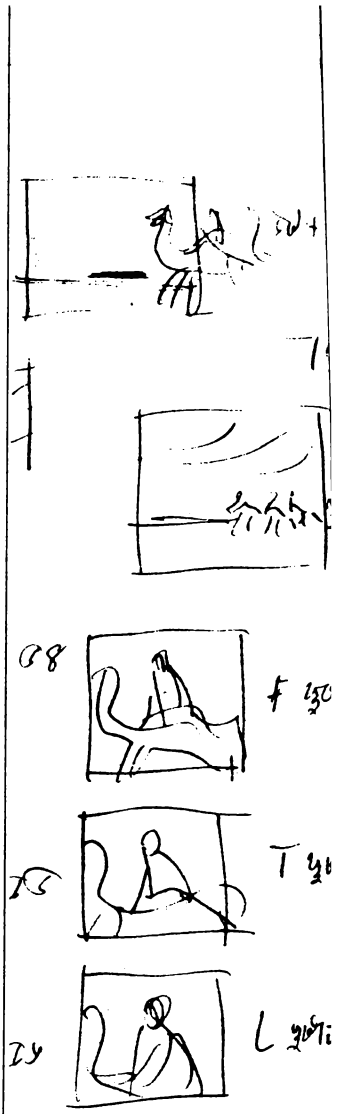

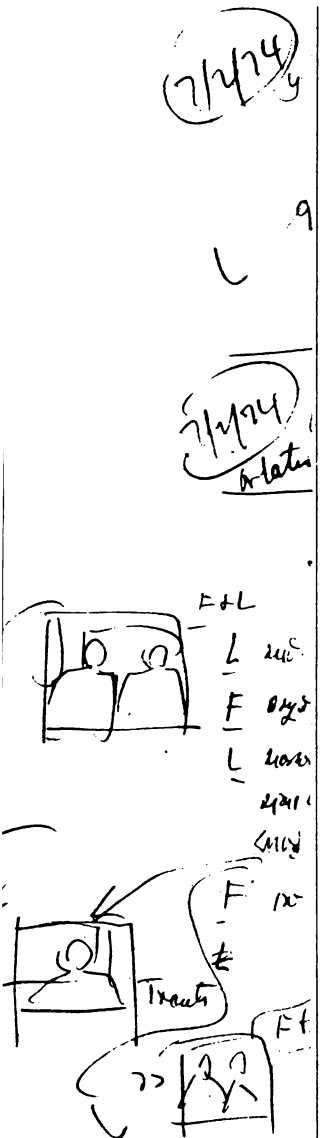

মোট কথা, শুটিং-এর আস্তো ট্রেনটার জন্য যখন হা-পিত্যেশ বসে বসে মেজাজ গেছে খিঁচড়ে, রীতিমতো খেপে গেছি, মহা চটে-মটে ওই ছড়া তিনটে লিখে ফেললাম! তারপর মানিকদারা এত দেরি করে ট্রেন নিয়ে ফিরলেন—সূর্যের আলো তখন নিবে যাবার সময়—সেদিন ভেস্তে গিয়ে, উট আর ট্রেনের দৃশ্যের শুটিং হলো পরেরদিন।'

খানিক আগে শ্রীনাথ উঁকি মেরে গেছিল। এবার ঘরে ঢুকল দু'পেয়ালা লিকার-চা ও দু'বাটি মুড়ি নিয়ে। মুড়ির সঙ্গে ভাজা-বাদাম আর লাল বাতাসা মেশানো। ফেলুদা একটা মুড়ির বাটি টেনে নিলো।

গরম চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে আমি বললাম, 'জানো ফেলুদা, উট-পর্বের ঠিক আগে, তোমার একটা শট্ আমাদের দারুণ প্রিয়!'

'বটে!'

'জয়সলমির যাবার পথে প্রথমবার যখন তোমাদের গাড়ির টায়ার পাংচার হলো, গাড়ি থেকে নেবে কাচ-ছড়ানো রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তোমার মাথায় খেলে গেল—বিয়ারের বোতল ভেঙে, রাস্তায় কে কাচ ছড়িয়েছে! আর অম্নি তুমি নিজের বাঁ-হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুসি মেরে, প্রায় লাফিয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলে, "আছে! আছে! আমার টেলিপ্যাথির জোর আছে! আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি, তাই আমাদের যাত্রা পণ্ড করার জন্য এই ব্যবস্থা!" তো—'

'তোর ভালো লেগেছে শট্টা?'

'টেরিফিক! তো ওই দারুণ শট্-এর দারুণ অ্যাকশনটা কি তুমি মাথা ঘামিয়ে বের করেছিলে? নাকি সত্যজিৎ রায় তোমার ওই অ্যাকশনটা চিত্রনাট্যেই লিখে রেখেছিলেন?'

আমি মুড়ির বাটিতে থাবা বসালাম। ফেলুদা চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে পর পর দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, 'সেটা মানিকদার 'খেরোর খাতা' ঘাঁটলেই বোঝা যাবে। যা—দেখে আয়।'

'ধ্যেৎ! এখন আবার 'সোনার কেল্লা'র শুটিং-স্ক্রিপ্ট ঘাঁটতে যাবো কেন?'

'শোন্, রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের ওপর তথ্যচিত্র দুটো ধরলে, 'অপুর সংসার' থেকে 'শাখা-প্রশাখা'—৩৩ বছরে মানিকদার ষোলোটা ছবিতে পার্ট করেছি। একজন চলচ্চিত্র-পরিচালকের সঙ্গে একজন অভিনেতার এই যে র‍্যাপোর্ট... এরকম জুটি... এই কোলাবোরেশন... মোট কথা, আমাকে অপরিহার্য মনে না-করলে নিতেন না। ছবিতে মানিকদাকে আমার যখন যেটুকু দেবার—সেটা দিতে পেরেছি বলেই, ৩৩ বছর ধরে তাঁর ছবিতে সুযোগ পেয়েছি! কিন্তু কোন্ চরিত্রে বা কোন্ দৃশ্যে কতটুকু আমার অবদান, কতটা মানিকদার ম্যাজিক—এ-সব বলা খুব মুশকিল!'

'এটা জানি, ব্যক্তিগত পছন্দের জন্য সত্যজিৎ রায় কাউকে ছবিতে নেবেন, সেটা হয় না। খাঁটি শিল্পীরা... নিজের ছবি কেউ যেচে খারাপ করে?'

'ওরে, যে-কোনও সখ্যতা বা সম্পর্কের চাইতে, শিল্প-সাহিত্য অনেক বড় জিনিস। আজ যদি লীলুপিসির বাড়িতে যাই, আমাকে কত আদর করে বসাবেন, মেঠাই খেতে দেবেন। তারপর যদি আমার পেয়ারের কারো একটা রাবিশ লেখা 'সন্দেশ'-এর জন্য গছাবার চেষ্টা করি, নির্ঘাৎ আমাকে পেটাবেন! বেনোজল ঢুকিয়ে 'সন্দেশ'কে তো আর ডোবানো যায় না!'

'তা তো বটেই!...পেটোয়া লোকেরা অ-যোগ্য হলে মহা বিপদ!'

'জীবন সর্দার, গৌরী ধর্মপাল, শিশিরকুমার মজুমদার বা অজেয় রায়, রেবন্ত গোস্বামীর মতো আশ্চর্য লেখকরা 'সন্দেশ'-এর আবিষ্কার, লীলুপিসি আর মানিকদার হাতে-গড়া! কিন্তু ওঁদের এই দারুণ সাফল্যের পেছনে কতটা নিজেদের অবদান, কতটা 'সন্দেশ'-সম্পাদকদের হাত-যশ—তার কি মাপ কষা যায় রে! এমনকি 'সন্দেশ' না-থাকলে মহাশ্বেতা দেবী ছোটদের জন্য লেখালেখি শুরু করতেন কিনা সন্দেহ!'

'সত্যজিৎ রায়ের ষোলোটা ছবিতে তোমার কিন্তু অফুরন্ত অবদান আছে! যাকে বলে মৌলিক অবদান।'

আলতো হেসে ফেলুদা বলল, 'মানিকদার সঙ্গে এক ধরনের গভীর ও আন্তরিক বোঝাপড়া ছিল। মনের যোগাযোগ। তাই আমাকে নিয়ে বারে বারে কাজ করতে মানিকদার সুবিধে হয়েছে। মনে রাখিস, সিনেমায় পরিচালকের ভূমিকাটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। গোটা দলটাকে তাঁর ভাবনা-চিন্তা মতো চালানো! তাই ছবিতে শিল্পী বা কলাকুশলীদের প্রচুর অবদান থাকে। অবিশ্যি সব মিলিয়ে... টোটালিটিতে সেটা হয়ে ওঠে পরিচালকের ছবি!'

'আকিরা কুরোসাওয়ার 'সেভেন সামুরাই' ছবিতে যেমন তোশিরো মিফুন-এর অভিনয়, কিম্বা সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত'য় সুব্রত মিত্রের ফোটোগ্রাফি! এই তো ব্যাপার?'

'এগ্‌জ্যাক্টলি!' হৈহৈ করে ফেলুদা বলল, 'মানিকদার 'অশনি সংকেত' ছবির যে কালার ফোটোগ্রাফি...সৌমেন্দু রায়ের কী দুর্দান্ত কন্‌ট্রিবিউশন! রঙিন ছবির অ্যাদ্দিনের কন্‌সেপ্টটাই পাল্টে গেল!'

'কিম্বা কুরোসাওয়ার 'খাগেমুশা' ছবিতে তাৎসুইয়া নাকাডাই-এর অভিনয়!'

'মানিকদা প্রথমে চিত্রনাট্য পড়ে শোনাতেন। তারপর বাড়িতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম চিত্রনাট্যটা। ব্যস, তারি মধ্যে আমার চরিত্রটা ডানা মেলে আপনি এসে ধরা দিতো আমার বুকের মধ্যে। তারপর হয়তো কিছুটা ইম্‌প্রোভাইজ করলাম। সেটাও খুব স্পন্টেনিয়াস। যেমন, নরসিং-এর সংলাপ মানিকদা বাংলায় লিখেছিলেন। আমিই সেটা ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বা হিন্দির ছোঁয়া-লাগা বাংলায় নিয়ে গেছিলাম। বঙ্গদেশের বাসিন্দা, রাজপুত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের চরিত্রটা... যাতে আরও জ্যান্ত হয়ে ওঠে!'

'মোট কথা, 'সোনার কেল্লা'য় তোমাদের গাড়ির দৃশ্যগুলো আমাদের অনেকেরি মনের মধ্যে গেঁথে আছে! সরসতা এবং রোমাঞ্চ মিলেমিশে —'

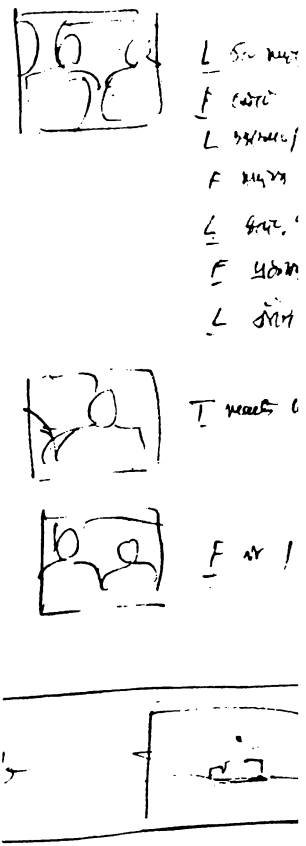

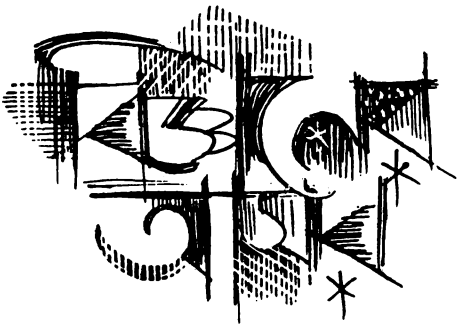

পূর্ণিমার চাঁদ

অমিতানন্দ দাশ

দিনে আর রাতে চাঁদের রং খেয়াল করে দেখেছ কি? দেখবে—দিনে চাঁদকে একটু নীলচে দেখায়, কিন্তু রাতে দেখায় প্রায় ধবধবে সাদা (কালচে ছোপগুলো ছাড়া অবশ্য)! দিনের আকাশ নীল কেন? বিজ্ঞানের পাঠ্য-বইতেই পাবে—উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্যকে যে-কারণে লাল দেখায়, সেই একই কারণে আকাশকে দেখায় নীল। সূর্যের 'সাদা' আলোতে লাল-কমলা-হলুদ-সবুজ-নীল-বেগুনি—সব রঙের আলো মিলে সাদা দেখায়, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো যাবার সময়ে কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নীল-বেগুনি আলো বেশি বিচ্ছুরিত হয় (মানে, ডাইনে-বাঁয়ে ছিটকে যায়), লালচে আলো অপেক্ষাকৃত বেশি সোজা যায়। এই বিচ্ছুরিত নীল আলো সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সারা আকাশকে নীল দেখায়। আকাশের আসল রং একদম বিশুদ্ধ কুচকুচে কালো—চাঁদহীন পরিষ্কার রাতের আকাশকে ঠিক যেমন দেখায়, তেমনি। দিনে আমরা আকাশ এবং সমস্ত দূরের জিনিসকে বাতাসের নীল কাচের মধ্যে দেখি—তাই দূরের পাহাড়কেও নীল দেখায়, দিনের চাঁদকেও নীলচে দেখায়।

চাঁদ নিজেও আসলে কুচকুচে কালো একটা পাথরের গোলা। চাঁদের গায়ে যে সূর্যের আলো পড়ে, তার বেশিরভাগই চাঁদের মাটি শুষে নেয়, মাত্র ১৬ ভাগের একভাগ প্রতিফলিত হয়। চাঁদের রং যদি শুভ্রগ্রহের মতো ধবধবে সাদা হতো, তাহলে জ্যোৎস্না এত জোরালো হত যে পূর্ণিমার কাছাকাছি মেঘহীন রাতে রাস্তায় আলো জ্বালাতে হত না।

সব পূর্ণিমাতে চাঁদকে কি সমান বড় দেখায়? একটা খুব সহজ পরীক্ষা করো—কোপার্নিকাস অবধি জ্যোতির্বিদেরা ঠিক যে-ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন, এটা তারই একটা সহজ সংস্করণ। একটা পাঞ্জাবির (সেলাই করে লাগাবার) বোতাম হাতে নিয়ে, হাতটা সটান লম্বা করে বোতামটা আকাশের চাঁদের দিকে ধরো। চাঁদটা বোতামের চেয়ে ঠিক কতটা বড় বা ছোট, সাবধানে খেয়াল করে লিখে রাখো। পর পর কয়েকটা পূর্ণিমাতে ঠিকভাবে পরীক্ষাটা করলেই বুঝতে পারবে—বিভিন্ন পূর্ণিমাতে চাঁদকে ছোট-বড় দেখায়! আসলে চাঁদের কক্ষপথ ঠিক গোলাকার না-হওয়াতে, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব

ছবি ১ : পূর্ণিমার চাঁদের চেহারা যতটা বাড়ে-কমে

সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে কমে-বাড়ে। আর বিভিন্ন পূর্ণিমাতেও চাঁদ কখনো একটু কাছে থাকে, কখনো একটু দূরে। চাঁদের চেহারা কতটা বাড়ে-কমে, ১ নম্বর ছবি দেখে বুঝতে পারবে। আকাশ সমান পরিষ্কার থাকলে, দূরত্বের তারতম্যের সঙ্গে বিভিন্ন পূর্ণিমাতে চাঁদের ঔজ্জ্বল্যও প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ে-কমে।

পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে কিসের ছবি দেখতে পাও বলো তো? খরগোশ? চরকা-কাটা-বুড়ি? কাঁকড়া? ২ নম্বর ছবিতে এই চেহারাগুলো দেখানো হয়েছে, ঠিক যেমন দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে। আসলে চাঁদের এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ে অঞ্চল বেশি আলো প্রতিফলন করে এবং সেই এলাকাগুলো বেশি উজ্জ্বল দেখায়। সমতল অঞ্চলগুলো কম আলো প্রতিফলন করে বলে কালচে দেখায়।

চন্দ্রতত্ত্ববিদেরা (ইংরেজিতে বলে 'সেলোনোজিস্ট') এখন মনে করেন যে চাঁদের বয়স যখন কম ছিল, তখন মাঝে মাঝে ছোট গ্রহাণু বা বড় ধূমকেতু চাঁদের বুকে আছড়ে পড়লে, চন্দ্রপৃষ্ঠের জমাট-বাঁধা **পাথর ফেটে** গিয়ে তলা থেকে গলা পাথরের স্রোত বেরিয়ে এসে, হাজার কিলোমিটার গলা পাথরের বন্যা বয়ে যেত। পৃথিবীতেও অনেকবার এরকম দুর্যোগ ঘটেছে—কেন, দক্ষিণ ভারতের মালভূমিই তো এই ধরনের প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়! তবে পৃথিবীর জল-হাওয়ার প্রভাবে এ সব প্রাগৈতিহাসিক প্রলয়ের চিহ্ন আপাতভাবে

ছবি ২ : পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে যে-সব ছবি দেখতে পাও

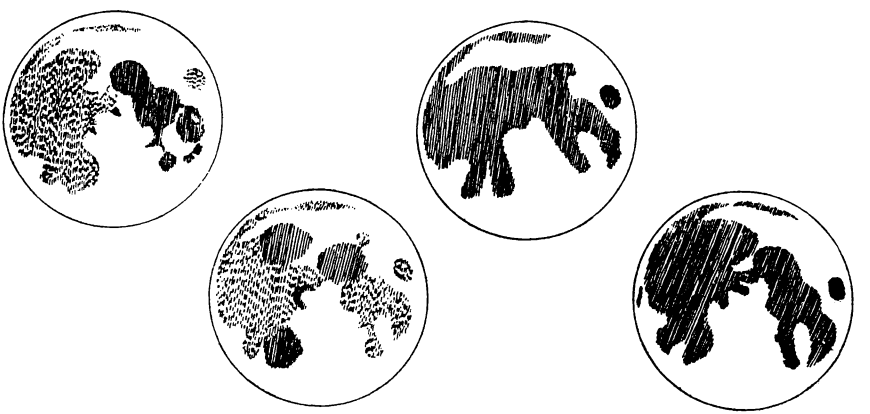

এসেছে, এবং আরেকটি রশ্মি উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। হিমালয়ের বুকে পূর্ণিমার কাছাকাছি রাতে বরফ পড়লে, চন্দ্রস্তম্ভ দেখা যেতে পারে।

পরের পূর্ণিমার কাছাকাছি রাতে চাঁদের চেহারাটা ভালো করে দেখো। দৃষ্টি প্রখর হলে এবং আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে, এখানে যে-ক'টা সাগর আর উপসাগরের নাম দেওয়া হল, তাছাড়াও বাড়তি দু'-চারটে দেখতে পাবে!

চন্দ্র অভিযানকারী কয়েকটি মহাকাশযান

তারিখ	মহাকাশযান (দেশ)	কোথায় নেমেছে	কী করেছে
১৩/৯/৫৯	লুনা-২ (রুশ)	বর্ষা সাগরের দক্ষিণে	মানুষের তৈরি প্রথম যন্ত্র পড়ল চাঁদের গায়ে
৩১/৭/৬৪	রেঞ্জার-৭ (মার্কিন)	জ্ঞাত সাগরের পূর্বদিকে	চাঁদের গায়ে আছড়ে পড়ার আগে রেডিওতে ৪৩০৮টি ছবি পাঠায়
৩/২/৬৬	লুনা-৯ (রুশ)	ঝঞ্ঝা মহাসাগরের দক্ষিণে	চাঁদে অবতরণ করে প্রথম চাঁদের মাটি নিয়ে পরীক্ষা করে
২০/৭/৬৯	অ্যাপোলো-১১ (মার্কিন)	প্রশান্ত সাগরের দক্ষিণে	মানুষের প্রথম পায়ের ছাপ পড়ল চাঁদের মাটিতে
১৭/১১/৭০	লুনা-১৭ (রুশ)	বর্ষা সাগরের উত্তর-পশ্চিমে	স্বয়ংক্রিয় চাঁদের গাড়ি দশ মাস ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ও ছবি তোলে
৫/২/৭১	অ্যাপোলো-১৪ (মার্কিন)	জ্ঞাত সাগরের উত্তর-পূর্বে	প্রথম মানুষ-চালিত গাড়ি করে চাঁদে ঘুরলেন মহাকাশচারীরা
৩০/৭/৭১	অ্যাপোলো-১৫ (মার্কিন)	বর্ষা সাগর ও শান্ত সাগরের মাঝামাঝি	পাহাড়ে অঞ্চলে চন্দ্রতাত্ত্বিক পরীক্ষা করলেন মহাকাশচারীরা
১১/১২/৭২	অ্যাপোলো-১৭ (মার্কিন)	শান্ত সাগরের পূর্বতীর ছাড়িয়ে	প্রথম ভূতত্ত্ববিদ চন্দ্রতাত্ত্বিক পরীক্ষা করলেন—আজ অবধি এটাই শেষ চন্দ্রযাত্রা

চাঁদের একটা ছবি এঁকে 'সন্দেশ'-আপিসে পাঠিয়ে দাও। যার ছবি সবচেয়ে ভাল হবে, সেটা 'হাত পাকাবার আসর'-এ ছেপে দেব । কোথায়, কত তারিখে, ক'টার সময়ে আঁকলে, তা লিখতে ভুলো না কিন্তু। সেইসঙ্গে তোমার নাম, গ্রাহক নম্বর ও বয়েস স্পষ্ট করে লিখবে।

শীত এসেছে

সনৎকুমার মিত্র

শীত এসেছে শ্বেত কুয়াশার চাদর দিয়ে গায়
শীত এসেছে ঘাসের শীষে শিশির ভেজা পায়,
শীত এসেছে নলেন গুড়ের সুগন্ধে মন ভরে
শীত এসেছে হাজার ফুলে বাগান আলো করে!

শীত এসেছে সরষে ফুলের সোনায় ভরা মাঠে
শীত এসেছে শান্ত নদীর আয়না নিয়ে ঘাটে,
শীত এসেছে খেজুর গাছে বেঁধে রসের ভাঁড়
শীত এসেছে ছড়িয়ে রোদে মিষ্টি স্নেহ তার!

শীত এসেছে হাতছানি দেয় করতে চড়ুইভাতি
শীত এসেছে সারাটি দিন ক্রিকেট খেলায় মাতি,
শীত এসেছে বসছে মেলা প্রতিটি সন্ধ্যায়
শীত এসেছে উলের ফুলের পোশাক দিয়ে গায়!

শীত এসেছে জড়িয়ে লেপে ঘুমের আরাম দিতে,
আয়েস করে পায়েস খাবার দিন এসেছে শীতে!

ভাইপোর সন্ধানে লুবিন খুড়ো

মূল রচনা ও ছবি : উইলিয়ম হিথ-রবিনসন

বাংলা রূপান্তর : চিত্রলেখা বসু

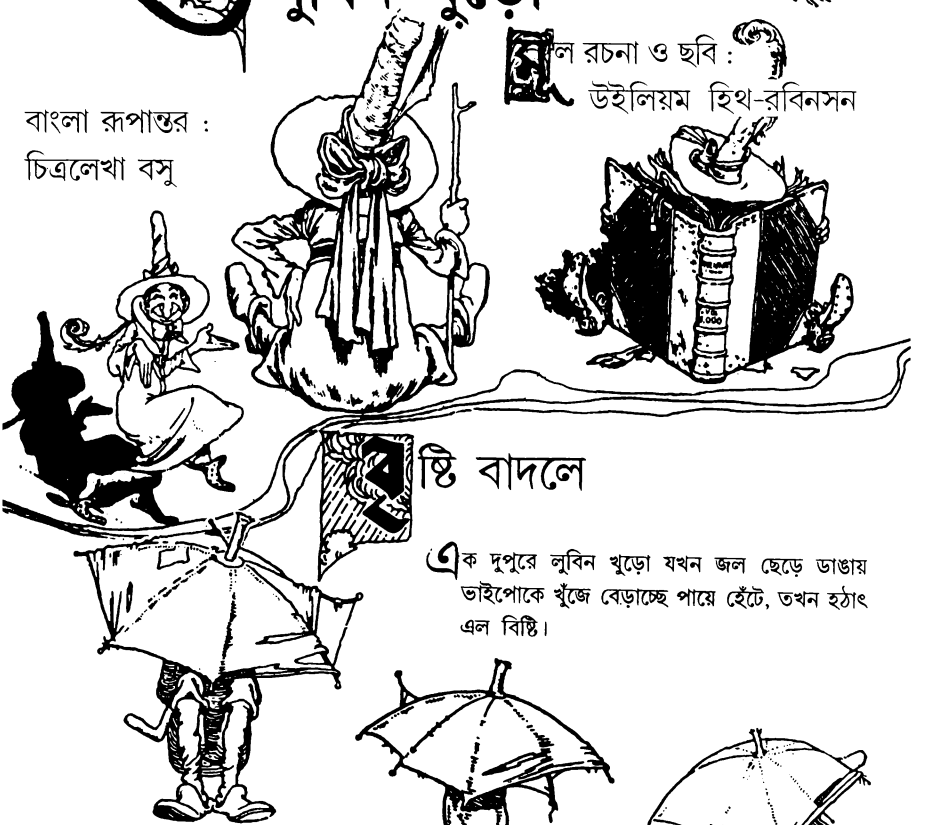

বৃষ্টি বাদলে

এক দুপুরে লুবিন খুড়ো যখন জল ছেড়ে ডাঙায় ভাইপোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পায়ে হেঁটে, তখন হঠাৎ এল বিষ্টি।

'এই রে!' বলল লুবিন খুড়ো, 'বিষ্টি নামল দেখছি।' দৌড়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল খুড়ো। আর ভাবল—ভয়ের কিছু নেই, বিষ্টি—সে তো একসময় থামবেই।

কিন্তু বৃষ্টি বাড়তেই থাকল। এমন মুষলধারে বৃষ্টি লুবিন খুড়ো আগে কখনও দেখেই নি। বৃষ্টি আদৌ থামবে কিনা—এখন লুবিন খুড়োর হল সেই ভাবনা। আর কী কাণ্ড! শিগগিরই সারা দেশটা ডুবে গেল জলের তলায়। খুড়োকে উঠে বসতে হল গাছের মাথায়, নইলে ডুবে মরা।

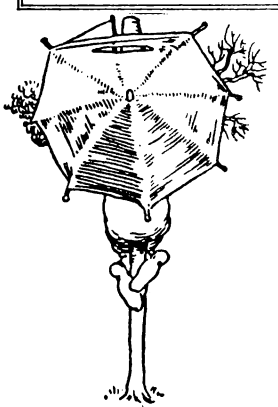

সারা দুপুর ধরে জল বাড়তে বাড়তে বাড়তে গাছের মাথার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। 'এবার বোধহয় ডুবে মরব,' বলল লুবিন খুড়ো, 'কী কুক্ষণে যে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।'

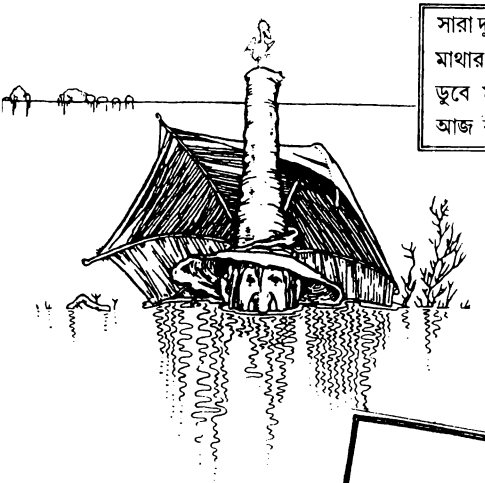

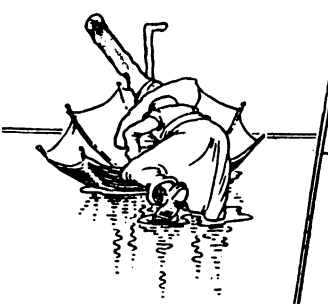

ঠিক যখন খুড়ো বাঁচবার সব আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখনই চিড়িক করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল খুড়োর সঙ্গে ছিল বহুদিনের পুরনো ছাতাটা। 'এটা জলে ভাসানো যায় কি?' বলল খুড়ো। ছাতাটাকে উল্টো করে রাখল সে। পুরনো ছাতাটা ভাসল চমৎকার, ঠিক যেন এক নৌকা। লুবিন খুড়ো সেই নৌকোর ওপর চড়ে বসে আবার ভেসে চলল অজানা পথে।

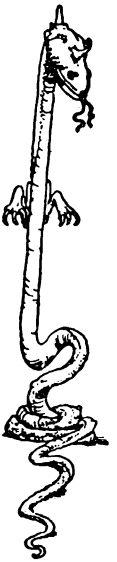

ড্রাগন-সাপের খপ্পরে

ভয় পাবার মানুষ নয় লুবিন খুড়ো। অভিযানে বেরিয়ে কখন ভয় পায়নি, এই একবার ছাড়া। এই একবারই। দারুণ ভয় পেয়েছিল লুবিন খুড়ো, ঘুরতে ঘুরতে সে গিয়ে পড়ল এমন এক জায়গায়—যেখানে জনমনিষ্যির নামটি নেই। দেখা হল এক ড্রাগন সাপের সঙ্গে। আর তার সে কী রূপ। বেচারা লুবিন খুড়ো তো ভয়ের চোটে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সাপটা খুড়োর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে গিলে ফেলতে চায়। এমন কুচ্ছিৎ প্রাণীও হয়!

অবশ্য একটু পরেই লুবিন খুড়োর সাহস ফিরে এল। হঠাৎই মনে পড়ল তার—সাপের দেখা পেলে (ড্রাগন-সাপ হলে তো কথাই নেই) তাকে বাজনা শুনিয়ে খুশি করে রাখার মতো ভালো ব্যবস্থা আর কিছুই নেই।

আর খুড়োর ভাগ্যও ভালো বলতে হবে—তার সঙ্গেই ছিল পুরানো এ্যাকোর্ডিয়ানটা! তৎক্ষণাৎ খুড়ো সেই যন্ত্রে কতকগুলো সুন্দর সুন্দর গৎ বাজিয়ে ড্রাগন সাপকে শোনাতে শুরু করে দিল।

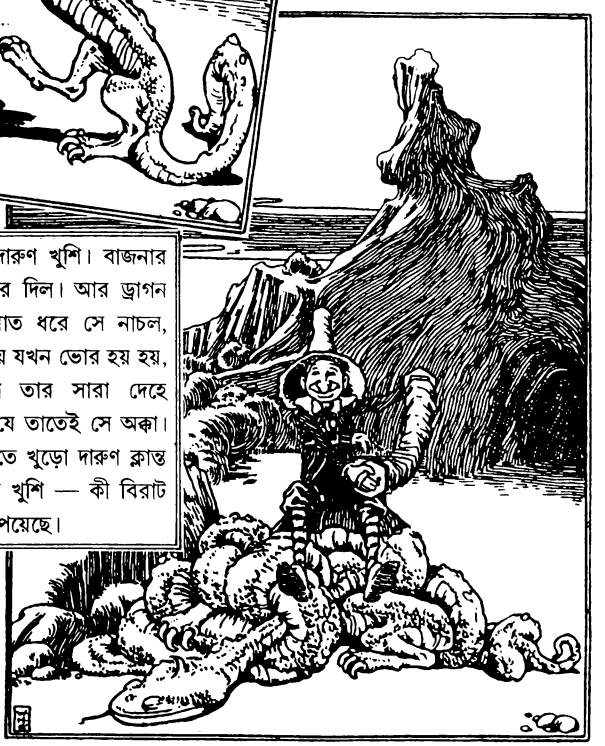

ড্রাগন সাপটা তো তাই শুনে দারুণ খুশি। বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করে দিল। আর ড্রাগন সাপের সে কী নাচ—সারারাত ধরে সে নাচল, নাচল আর নাচল। রাত ফুরিয়ে যখন ভোর হয় হয়, সূর্যের আলোয় দেখা গেল তার সারা দেহে এতোগুলো গিট পড়ে গেছে যে তাতেই সে অক্কা। সারারাত ধরে বাজাতে বাজাতে খুড়ো দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তবু সে দারুণ খুশি — কী বিরাট বিপদ থেকেই না সে মুক্তি পেয়েছে।

চলবে

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

জীবন সর্দার

সূর্য ওঠা আর সূর্য অস্ত যাবার সময় আকাশের রঙ ফেরা আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি। চাইলে সে দৃশ্য রোজই দেখতে পাই। কিন্তু সূর্যগ্রহণ চাইলে ত' রোজ রোজ দেখা যায় না। সেই সময়ে সূর্যকে ঘিরে আলোর রকমারি নকশা যারা দেখেছে অয়ন ঘোষ তাদের মধ্যে একজন। প্রকৃতি পড়ুয়াদের সূর্যগ্রহণ দেখার দলে সে ছিল বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। তার দেখা বিবরণ গ্রহণের দৃশ্যকে হুবহু আমাদের চোখের সামনে হাজির করেছে। —**জীবন সর্দার**

গ্রহণের আলো

অয়ন ঘোষ

একঝাঁক প্রকৃতি পড়ুয়া নিশ্চিন্দপুর সেচ বিভাগের 'রবীন্দ্র শিশু উদ্যান' ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। এমনি একটা দলের সঙ্গে আমিও পৌঁছে গেলাম বেছে রাখা জায়গাটাতে। পিছনে একটা চুনকাম করা দেওয়াল, সামনে রাস্তা পেরলে ক্ষেত জমি, বাঁ ধারে সেচখাল। রাস্তার ধারে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ইউক্যালিপ্টাস, বাবলা, মেহগনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

মাটি ছেড়ে আকাশে নজর দেবার আগের মুহূর্তে চোখ ঢাকা পড়ল বিশেষ চশমায়। তার আগে ভোরের লাল সূর্যের আলোর মত নরম, ঠাণ্ডা মৃদু আলোয় এক ঝলকে দেখে নিয়েছি ঘড়ির কাঁটা ৮.৪৫ ছুঁই ছুঁই। আকাশে তখন নীলচে সাদা এক চিল্‌তে সূর্য। নখের মতন সরু।

আন্দাজ মিনিট দুই পর ঘড়ির দিকে তাকালাম, ৮.৪৭। পিছনের দেওয়ালে ছায়ালহরীর সন্ধান করা উচিত এবার। কিন্তু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও ছায়ালহরীর দেখা না পেয়ে আবার আকাশে তাকালাম। সরু নখটার তীক্ষ্ণ কোণা দুটো ভোঁতা হয়ে গেছে। সূর্যটা এখন একটা বাঁকা রেখা মাত্র। রেখাটার বাঁদিকে দেখা দিল একটুকরো গাঢ় ছায়া। উজ্জ্বল রেখাটার দুপাশে আরও ছায়া ঘনিয়ে আসছে। দৈর্ঘ্যে ছোট হয়ে গেল রেখাটা। মাঝখানের শেষ অংশটুকুর উপর ঝুঁকে পড়া কয়েক টুকরো ছায়ার আভাস পেলাম। নিঃশেষে মুছে যাবার আগের মুহূর্তে আলোর রেখার শেষটুকু ভেঙে, জ্বলে উঠল তিনটি সাদা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু, মুক্তোর ঢলঢল আভা বুকে নিয়ে তিনটি মুক্তোর এক মালা। আমার ভেতরকার আবেগে চোখ থেকে চশমা সরাতে সরাতেই নিভে গেল সমস্ত আলোটুকু। সাদা আলো মুছে যেতেই সূর্যের চারপাশ ঘিরে ছড়িয়ে পড়ল হালকা কমলার সাথে রক্তলাল মেশান রঙের আভা, মুহূর্তের জন্য এসেই বলয়ের নীচের প্রান্তে সামান্য ডানদিক ঘেঁসে ক্ষীণ আলোর একটা কণা ঠিকরে এল। দ্রুত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল সেটা। ঝলসানো দ্যুতি সইতে না পেরে কখন যে চোখে চশমা দিয়েছি মনে নেই। হীরের আংটি

দ্যুতি হারাতেই চশমা খুললাম। রঙের বৈচিত্র্য ছিল না হীরের প্রভায়। নাকি রঙ দেখার মতো সময় ছিল না হাতে! বুঝিনি।

চারপাশ ভরে গেছে জ্যোৎস্নার মতন স্নিগ্ধ আলোয়। তফাৎ শুধু এই আলোতে সাদার বদলে হলুদ আভা। আকাশে তখন সূর্যের মাথায় আলোর মুকুট। কালো ছায়াকে ঘিরে বলয়ের মতন আলোকমণ্ডল (করোনা)। তার উপর নিচে দীর্ঘ আলোর ছড়ানো অংশ। সাদা আলোকমন্ডলের চারপাশে ঘিরে হলদেটে কমলা আলো। জানিনা এ রঙ সূর্যের, নাকি বায়ুমণ্ডলের রহস্যময় খেলা।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না। কোন এক সতর্ক সঙ্গীর কাছে শুনলাম এক মিনিট পাঁচ সেকেণ্ড পুঁজির সিংহভাগটাই খরচ করে ফেলেছি। চশমা চোখে দিতেই সৌরকিরীট মুছে গেল চোখ থেকে। স্বল্প ঔজ্জ্বল্যের অধিকার নেই চশমার চৌকাঠ পেরবার। তখন আবার আকাশে ফুটে উঠেছে সরু নখের মতন সূর্য। শুরুতে ছিল কালো ছায়ার নীচের প্রান্তে, এখন উপর প্রান্তে।

তারপর ধীরে ধীরে সূর্যের নিজেকে ফিরে পাওয়া দীর্ঘ সময় ধরে। আমরা তখন নজর ফেরালাম আকাশ থেকে মাটিতে।

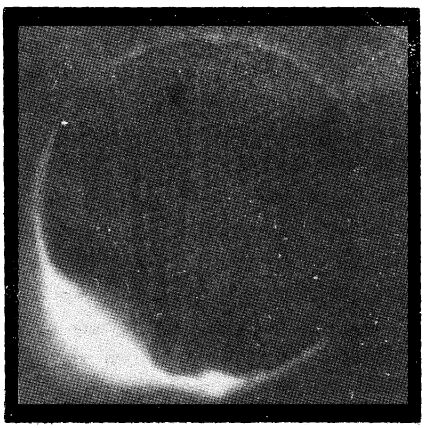

প্রকৃতি পড়ুয়ার নজরে হঠাৎ

পিঞ্জোলা বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রাহক সংখ্যা ২৬১৯

আমাদের দেশের বাড়িতে সিমলাগড়ে লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে গেছিলাম। ওখানে আমার কোন সঙ্গী নেই। তাই গল্পের বই পড়া ছাড়া কোনও কাজই আমার ছিল না। সব সময় গল্পের বই পড়াও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এরকম সময় কি করব কি করব ভাবছি। হঠাৎ দেখি একটা কালো পোকা জানলা দিয়ে ঢুকছে আবার কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে যাচ্ছে। পোকাটাকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করছি। এবার দেখলাম প্লাগ্ আটকানোর গর্তে পোকাটা ডিম পেড়েছে। আর বারবার পুকুরের ধারের ভেজা মাটি এনে গর্তের মুখটা সুন্দর করে সামনের দুটো পায়ে বুজিয়ে দিচ্ছে। একদম শেষে শুকনো ছাই দিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে দিয়ে উড়ে পালালো। কিছুদিন বাদে দেখি গর্তের মুখটা ফাটিয়ে ভেতরের ডিমটা পূর্ণাঙ্গ পোকা হয়ে উড়ে গেছে। সেই চোখের সামনে দেখা ঘটনাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল।

[*ফের যদি এমন ঘটনা দেখতে পাও তখন লক্ষ্য করবে পোকাটি সত্যি সত্যি কালো, নাকি তার ডানা বুক পেট অন্য রঙের— হতে পারে সবুজ, গাঢ় সবুজ, তাই কালো দেখায়। আরও দেখতে হবে গর্তটি সে কিভাবে বানাচ্ছে। মুখ দিয়ে বানিয়ে মুখ দিয়েই বুজিয়ে দিচ্ছে কিনা! গর্তের মুখ বন্ধ করতে সত্যি ছাই নিয়ে এলো কী? নাকি মুখের ভেজা মাটিতেই কাজ সারা হল। গর্ত থেকে ডিম ফুটে, বাচ্চা পোকা কতদিনে বের হয়ে এল সেটাও দেখা দরকার। একটু ধৈর্য্য ধরে দেখলে 'কুমোর পোকা'র আরও সব রহস্য ধরা পড়বে। —**জীবন সর্দার***]

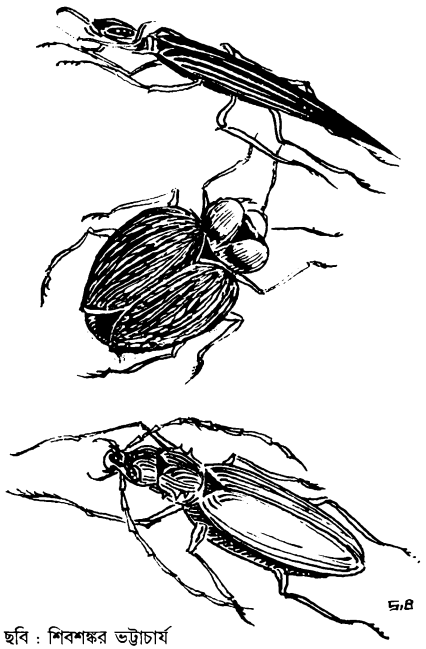

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

শীতকালে গাছের পাতা ঝরা

রাজর্ষি গড়াই

আমরা রোজ সকালে যখন ঘুরতে বেরোতাম তখন দেখতাম শীতের শেষে অনেক অনেক গাছের পাতা হলদে হয়ে গিয়েছে। সেগুলি আস্তে আস্তে ঝরে পড়ত। ঐ সব গাছের নাম আমরা জানতাম না। বাবা রোজ আমাদেরকে গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে কিছু কিছু গাছ চিনিয়ে দিত কেননা বাবাও সব গাছের নাম জানে না। বাবা আমাদের যে গাছগুলি চিনিয়ে দিয়েছিল তাদের মধ্যে আমরা দেখলাম শীত শেষ হতেই কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমূল, পাকুড়, পেয়ারা, টগর এই সব গাছের পাতা একেবারে ঝরে গিয়েছে। আমরা খুব ভাল করে দেখলাম কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমূল গাছগুলির পাতা এসব এক- সঙ্গেই ফাল্গুন মাসের শুরুতেই ঝরে গিয়েছিল। এদের মধ্যে রাধাচূড়া গাছের পাতা সবার আগে বের হতে শুরু হয়ে ছিল। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার পাতা চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে বের হতে শুরু হয়েছে। আবার দেখলাম আমড়া ও শিমুলে কচি পাতা বের হবার আগেই কুঁড়ি ধরেছে। আবার রাধাচূড়ার হলদে রঙের ফল ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে। জামরুল ও জাম গাছের পাতা একসঙ্গে সব না ঝরে কচি পাতা বের হবার পর পুরানো পাতা একে একে ঝরে যায়।

প্রকৃতি পড়ুয়ার মেঠো খসড়া থেকে

শুঁয়োপোকার গুটি

প্রীনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার দাদার বাড়িতে করবী গাছে একদিন দেখি রূপোর মতোন কি একটা চক্‌চক্ করছে। আমরা ভাবলাম কানের দুল নাকি? কাছে গিয়ে দেখলাম দুল তো নয়, গাছের পাতায় লেগে আছে কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মালি বলল ওটা হল একরকম শুঁয়োপোকার গুটি। আমরা বিশ্বাস করলাম না— শুয়োঁপোকার গুটি বুঝি এত সুন্দর হয়? মালি পাতাটা ছিঁড়ে ঘরে সুইচ বোর্ড-এর ওপর ঝুলিয়ে দিল। দুদিন পরে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি— সত্যিই তো, সেই রুপোলি গুটিটা থেকে একটা মথ একটুখানি মুখ বার করেছে। কাজকর্ম ফেলে আমরা সবাই সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে হুশ করে বেরিয়েই উড়ে গেল একটা মথ, আর ওমনি গুটিটা হয়ে গেল কালো, কোথায় গেল তার সেই রুপোলি রঙ। পোকাটাও দেখতে বেশি ভাল নয়— দিদা বলল ও বোধহয় আস্তে আস্তে সুন্দর হবে।

তোপ্‌সেদা, আমি, ফেলুদা

কুশল চক্রবর্তী

কেউ 'সোনার কেল্লা' ছবির কথা বললে, সবচেয়ে আগে আমার মনে পড়ে যায় ও-ছবির টাইটেল কার্ড! সেই মাঝরাত্তিরে মুকুল নিজের আঁকা একগাদা ছবি দেখাচ্ছিল মা-বাবাকে। হঠাৎ পর্দা-জুড়ে সেই-সব ছবিতেই ফুটে উঠতে লাগল শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম। ছবির শেষেও এলো কাঁচা-হাতের আঁকিবুঁকি : 'তোপ্‌সেদা, আমি, ফেলুদা'! খুব ছোট্টবেলা থেকেই আমি ছবি আঁকি, আর সেই সূত্রেই প্রথম গেছিলাম মানিকজেঠুর (সত্যজিৎ রায়) বাড়িতে। কিন্তু মুকুলের দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকা 'সোনার কেল্লা'র সমস্ত ছেলেমানুষি আঁকিবুঁকিরই স্রষ্টা স্বয়ং মানিকজেঠু!

যখন 'সোনার কেল্লা'য় অভিনয় করি, তখন ফেলুদাকে চিনতাম না, তার সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। যদিও মানিকজেঠুর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে তারও দু'বছর আগে। এবং অদ্ভুত কৌশলে তারও আগে জেঠুর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটাও দেখে ফেলেছি। 'অদ্ভুত কৌশলে' বললাম এইজন্যে, প্রথমবার আদ্দেকটা ছবি দেখে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দ্বিতীয়বার ঘুমিয়েছিলাম আদ্দেক ছবি দেখার আগেই। দুটো দেখা জুড়ে যদি পুরো ছবি দেখা হয়, তাহলে-মানিকজেঠুর সঙ্গে আমার পরিচয় সেই তিন বছর বয়সে। আর ফেলুদা-সিরিজের প্রথম ছবি 'সোনার কেল্লা'য় মুকুল হলাম সাত বছর বয়সে। আজ ২৭ পেরনো বয়সে সেদিনের কথা লিখতে বসে, মনে হয় যেন বহুকাল আগের কয়েকটা স্বপ্নে-দেখা দিন!

ক'দিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুটিং করে, এক শীতের সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে তুফান এক্সপ্রেসে চেপে, আমাদের যাত্রা হল শুরু। এর আগে বেশ কয়েকবার ট্রেনে চেপে মধ্যমগ্রাম থেকে বিরাটি অথবা কলকাতায় এসেছি-গেছি। কিন্তু এবারকার যাত্রা একেবারেই আলাদা। প্রায় এক মাস থাকতে হবে রাজস্থানে। আমাদের দলের সঙ্গে চলেছেন আমার বাবা (অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী)। আমার বোন তখন খুবই ছোট, তাই মা আমাদের সঙ্গে যেতে না-পারলেও সেদিন হাওড়া স্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছিল। গাড়ি ছাড়তেই দেখি মায়ের চোখে জল, আমার চোখেও জল আসি-আসি করছে! কিন্তু সেটা সাময়িক ব্যাপার। কারণ তার আগেই জেনে গেছি—শুটিং মানেই পিকনিক, একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার!

মনে আছে, আমার চোখে জল দেখে ফেলুদা মানে সৌমিত্রকাকু প্রশ্ন করেছিলেন, 'কুশলের কি মায়ের জন্যে মন-কেমন করছে?'

উত্তরে কী বলেছিলাম, মনে নেই। সত্যি বলতে কি, মায়ের চেয়েও তখন আমার বেশি কষ্ট হচ্ছিল বোনের জন্যে। যদিও এ-সব মনখারাপ-টারাপ বেশিক্ষণ টেকেনি। কারণটা তো আগেই বলেছি, শুটিং মানেই পিকনিক!

মনে পড়ে, পথে আমরা তাজমহল দেখে সন্ধ্যের সময় দিল্লি পৌঁছালাম। অবিশ্যি তাজমহল দেখেছিলাম ট্রেনে বসে, বহুদূর থেকে। সেই ঐতিহাসিক সৌধটির

দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গান ধরেছিল ননীকাকু (অভিনেতা ননী গাঙ্গুলি) : 'তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল...'।

দিল্লিতে আমার কাজ ছিল পরের দিন ভোরে। কেবল দুটি কথা : 'এটা সোনার কেল্লা না।'

ডাঃ হাজরা : 'এ-জায়গাটার নাম জানো তো?'

আমি : 'দিল্লি।'

ব্যস, কেবল এইটুকু। কিন্তু ভোর মানে যে মাঝরাত, তা কে জানত!

ভালো করে তখনও অন্ধকার কাটেনি, পুনুকাকুর (সহকারী পরিচালক পুনু সেন) চিৎকারে ঘুম ভাঙল : 'আর্মি, গেট রেডি!'

এটা ছিল শুটিংয়ে তৈরি হবার আহ্বান। যুদ্ধে যাবার আগে সৈন্যদের প্রতি যেন সেনাপতির আহ্বান! পরেও এই ডাক বহুবার শুনেছি, এবং শুনতে শুনতে এমন একটা হাড়-কাঁপানো আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল যে কী বলব! রাজস্থানের মরু-অঞ্চল, শীতের রাত, লেপ-কম্বলের তলায় গুড়িশুড়ি মেরে ঘুমিয়ে আছি, যেন বাইরে কোথাও বরফ পড়ছে, হঠাৎ কানের কাছে সেই পিলে-চমকানো ডাক : 'আর্মি, গেট রেডি!'

দিল্লি থেকে জয়পুর। আমাদের আশ্রয় 'খাসা কুঠি' নামে এক সার্কিট-হাউস। এখানে নাহারগড় পাহাড়ে আমাদের কাজ। আসল ডাঃ হাজরাকে (শৈলেন মুখোপাধ্যায়) এই পাহাড়ের ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হবে। আমরা শুটিং করতে করতেই দিব্যি পাহাড়-চুড়োয় উঠছি। পাহাড়ে ওঠায় আমার সঙ্গে মানিকজেঠু ছাড়া কেউ-ই পারছে না। আমি আর জেঠু, দু'জনে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছি। কখনও আমি ফার্স্ট, কখনও জেঠু।

জয়পুরের একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যেবেলায় শুটিং থেকে 'খাসা কুঠি'তে ফিরে এসে আমরা বেশ অনেকক্ষণ ধরে খাবার টেবিলে ঠায় বসেছিলাম—খাবার আর আসে না! খিদের জ্বালায় পেট চুঁই-চুঁই করছে। ওদিকে একদল বিদেশি ছেলে-মেয়ে খুব হৈ-হুল্লোড় করছে খেতে বসে। সংখ্যায় ওরা প্রায় ৫০-৬০ জন। হোটেলের লোকজন ওদের সামলাতেই ব্যস্ত।

একে পেটে খিদে, তায় ওদের চিৎকার! বিরক্তিকর অবস্থা! হঠাৎ বিশাল ডাইনিং হল কাঁপিয়ে কোথা থেকে একটা অতিকায় মোরগ ডেকে উঠল! ব্যাপারটা ঠিক কী, তা বুঝতে না-পেরেই বিদেশি ছেলে-মেয়েরা ঘাবড়ে গিয়ে বোবা হয়ে গেল!

এটা হলো কামুকাকুর ('মন্দার বোস' কামু মুখোপাধ্যায়) কীর্তি। মুখ বন্ধ রেখে অদ্ভুত মোরগ-ডাক ডাকতে পারে কামুকাকু। হঠাৎ শুনলে ভয় পাবারই কথা। সেদিন খিদের মুখে ডাকটা কেমন হয়েছিল, একবার কল্পনা করো!

কামুকাকুর মতো মজাদার জমাটি লোক, খুব কমই দেখেছি। দু-চার কথায় মানুষটির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, তবু দু-একটা নমুনা দিচ্ছি। মরুভূমির মধ্যে যেতে যেতে কেউ হয়তো বলল, 'দেখুন, বড় বড় ঘাসগুলোকে কেমন শুকনো গমগাছের মতো মনে হচ্ছে।' অম্‌নি কামুকাকু বলে উঠল, 'তাইতো চারদিক এমন গম্‌গম্ করছে!'

কুয়ো থেকে জল আনার গল্পটা প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ে পড়ে! একবার মরুভূমির মধ্যে শুটিং করতে করতে খাবার-জল শেষ হয়ে যায়। স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কামুকাকু একটা কুয়ো থেকে জল আনতে গেল। খানিক বাদে এক ড্রাম জল নিয়ে ফিরল। এসেই বলল, 'সবাই বলে কুয়োর এমনি মাহাত্ম্য যে গ্রীষ্মকালেও কুয়োর জল শুকোয় না!' এরপর কামুকাকুর মন্তব্য : 'দেখলাম কুয়োটার মধ্যে কয়েক হাজার ব্যাঙ! যদি তারা প্রতিদিন কিছুটা জল ছাড়ে, তাহলে এ-কুয়ো জল-শূন্য হবে কেন? এটা কুয়োর মাহাত্ম্য না ব্যাঙের মাহাত্ম্য?'

এহেন কামুকাকুও কিন্তু একবার আমার কাছে বেশ জব্দ হয়েছিল! অবিশ্যি এতে আমার কোনো হাত ছিল না। সেটা জয়পুরের ঘটনা। 'খাসা কুঠি'তে আমাদের ব্রেকফাস্টে দুটো করে হাফ বয়েলড্ ডিম দিত । আমি দুটো ডিম খেতে পারতাম না। তাই দেখে কামুকাকু একদিন আমার ভাগের একটা ডিম নিয়ে নিজের প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়। ইচ্ছে ছিল শুটিং করতে করতে খিদে পেলে খাবে।

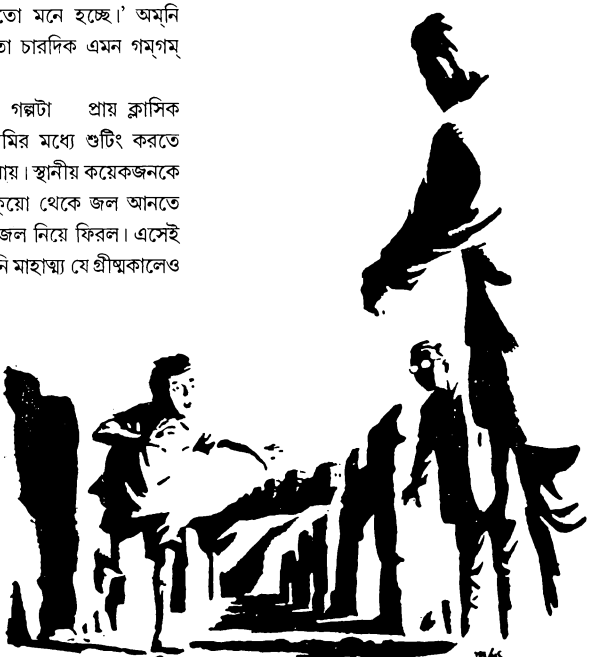

সেদিন ছিল নাহারগড় পাহাড়ে শুটিং। শুটিং করতে করতেই পাহাড়ে ওঠা হচ্ছে, কখনও আবার বসা হচ্ছে। হঠাৎ এক সময় কামুকাকু বসতে গিয়ে ডিমটাকে প্যান্টের পকেটে ফাটিয়ে ফেলে, সে এক বিশ্রী অবস্থায় পড়ে যায়! ভেবে দ্যাখো, কী করুণ ব্যাপার! ভাগ্যিস, আমি ছাড়া আর-কেউ ডিমটার কথা জানত না!

পরদিন আবার কামুকাকুকে বাড়তি ডিম দিতে যেতে, গোমড়া-মুখে কামুকাকু বলল, 'খুব শিক্ষা হয়েছে, আর তোমার ডিম নেবো না।'

রাজস্থানের দুটো জিনিস ছিল আমার খুব পছন্দের। এক, রোজই উটের মাংস খাওয়া, আর দুই, শুতে যাবার আগে মুখে ক্রিম মাখা। মাংসটা অবিশ্যি সত্যি সত্যি উটের কিনা বলতে পারব না। তখন কিন্তু মনে হত নির্ঘাত উটের! আর জেঠিমা (বিজয়া রায়) মরুভূমিতে গালের চামড়া ফাটার ভয়ে, রোজ রাতে শোবার আগে নিজের মুখে ক্রিম মেখে, আমার মুখেও মাখিয়ে দিতেন। আপত্তি করতাম, কিন্তু আমার আপত্তি টিকত না! তবে উটের (?) মাংসের বদলে মাঝে মাঝেই আমার আর তোপ্‌সেদার (সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়) জন্যে আলাদা ব্যবস্থা হত ।

মনে পড়ে, একবার যোধপুরে ব্রেকফাস্ট-টেবিলে বাবুদা (সন্দীপ রায়) ক্যাসেটে নাক-সানাই শোনায়। সকলে খেতে বসেছি, হঠাৎ বাবুদা খুব ছোট্ট এক টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেট ভরে চালিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে সমবেত এক বিচিত্র বাদ্যধ্বনি। কিছুক্ষণ শোনার পর দেখি সকলেই মিটি-মিটি হাসছে। সে-হাসিতে যোগ দেয়নি কেবল দু'জন। এক, কামুকাকু। দুই, অজয়জেঠু ('নকল ডাঃ হাজরা' অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়)। আসলে সেই ক্যাসেটে তোলা ছিল ওদেরই নাসিকা-ধ্বনি!

খানিক শোনার পর কামুকাকু আপন মনে বলল, 'আমার নাক ডাকে না।'

অজয়জেঠু বলল, 'আমারও না!'

সকলে বাবুদার মুখের দিকে তাকাতে বাবুদা বলল, 'ওদের দু'জনেরই। টেপ করেছি আজ ভোর রাতে।'

রাজস্থানে শুটিং-এর পর আমার অবসর সময় কাটত জেঠিমা ও মানিকজেঠুর সঙ্গে দাবা খেলে আর ম্যাজিক দেখে। রাজস্থানে যাবার কিছু আগে দাবাটা শিখেছিলাম বাবার কাছে। খেলার সঙ্গী না-পেয়ে, বাবা আমাকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলেন। গোপনে বলে রাখি, বাবার কাছে খেলা শিখে মাঝে-মধ্যে বাবাকেও মাত্ করে দিতাম। সেখানে জেঠিমাকে হারানো তো সহজ ব্যাপার! এখন মনে হয়, আমাকে খুশি করবার জন্যেই কি জেঠিমা অমন মাত্ হবার জন্যে মুখিয়ে থাকতেন? তবে মানিকজেঠুকে কোনো দিনই মাত্ করতে পারিনি। উপরন্তু মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে নিজেই মাত্ হতাম।

অবসর বিনোদনের আর-এক পন্থা ছিল ম্যাজিক। কী-সব মজার মজার ম্যাজিক দেখাতেন মানিকজেঠু, আজ ভাবতেও অবাক লাগে! কোনো দিনই ম্যাজিকের গোপন কৌশল ধরা যায়নি। আর ছিল মেমারি-গেম ও ক্যাটিগারি খেলা। এ-দুটোয় সব সময় প্রথম হতেন ফেলুদা (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), নয়তো ফেলুদার স্রষ্টা মানিকজেঠু। এ-সব খেলায় আমি ছিলাম সম্পূর্ণ এলেবেলে!

'সোনার কেল্লা'র শেষ দৃশ্যের একটা শট্-এর নেপথ্য কথা না-বললে, এই স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থাকবে। ফেলুদার আদেশে ওদের গাড়ির ড্রাইভার সিংজী নকল ডাঃ হাজরা অজয়জেঠুকে ধরে কোলে নেবার সময় আমাকে হো-হো করে হেসে উঠতে হয়েছিল। তার সঙ্গে সংলাপ ছিল : 'তোপ্‌সেদা দ্যাখো, দুষ্টু লোকটাকে সিংজী কেমন কোলে তুলেছে!' এরপরেই হাসি। অফুরন্ত, হো-হো করে!

ক্যামেরা চলার আগে মানিকজেঠু বলেছিলেন, 'হাসির আগে একবার আমার দিকে তাকাবে, তাহলেই হবে।'

সেদিন সংলাপ শেষ করে জেঠুর দিকে তাকাতেই দেখি—জেঠু এমন মজার মজার মুখভঙ্গি এবং দেহভঙ্গি করছেন যে না-হেসে উপায় নেই! রামগড়ুরের ছানার মুখেও হাসি ফুটবে!

বেঁটে রাজপুত্র

নরেন্দ্র দেব

এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর চার পুত্র।

চার রাজপুত্রের মধ্যে তিনজনই বেশ বলিষ্ঠ আর দীর্ঘকায়। কিন্তু কনিষ্ঠ রাজপুত্র অত্যন্ত খর্বাকৃতি। তবে দুর্বল নয়, বরং অধিকতর বলবান!

দীর্ঘকায় তিন রাজকুমারের রূপও ছিল কার্তিকের মতো সুন্দর। কিন্তু ছোট-রাজপুত্র শুধু মাথায় বেঁটে নয়, তার চেহারাও খুব সুশ্রী ছিল বলা চলে না। রাজা তাই তাঁর রূপবান রাজপুত্রদেরই ভালোবাসতেন বেশি। আর বেঁটে রাজকুমারকে একটু উপেক্ষার চোখেই দেখতেন। রাজার কাছে ছোট ছেলেটির বিশেষ আদর ছিল না।

ছোট ছেলে কিন্তু তার দাদাদের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। সে ঠিক বুঝতে পারত—তার বাবা দাদাদের যতটা ভালোবাসেন, তাকে ততটা ভালোবাসেন না। কেন বাসেন না, সে-কারণটাও সে বুঝে ফেলেছিল। সে যে দাদাদের মতো দীর্ঘ আর গৌরবর্ণ নয়। তার চেহারাও যে অন্য রাজপুত্রদের মতো সুন্দর নয়।

এটা বুঝতে পেরে, তার মনে ভারি কষ্ট হত। একদিন রাজাকে একলা পেয়ে, সে কাছে গিয়ে প্রণাম করে, পদধূলি মাথায় নিয়ে বললে, 'পিতা! আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমি আপনাকে বলতে এসেছি—কোনও ব্যক্তি রূপবান এবং দীর্ঘ আর বলিষ্ঠদেহ হলেই, শ্রেষ্ঠ হয় না। খর্বকায় রূপহীন মানুষও—অনেক সময় তাদের চেয়ে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোনও জিনিসের আকৃতি বড় হলেই, তার মূল্য বেশি হয় না। হীরে-মণি-মাণিক্য অতি ক্ষুদ্র হলেও, তা বহু মূল্যবান! মাতৃপূজায় নিবেদনের জন্য ক্ষুদ্র ছাগলই বলির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, বিরাটকায় হাতি কখনও নির্বাচিত হয় না। একটা ছোট্ট টাট্টুঘোড়া যে-বেগে ছুটতে পারে, একটা বড় গাধা তা পারে না। সুতরাং ছোট বলে আপনি আমাকে অবহেলা করবেন না। আমার বৃহদাকার জ্যেষ্ঠদের চেয়ে আমি ক্ষুদ্রাকার হলেও, অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জানবেন। আমার এই আত্মশ্লাঘা ও স্পর্ধা প্রকাশ—দয়া করে ক্ষমা করবেন।'

কনিষ্ঠপুত্রের মুখে এই রকম জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে, মহারাজের মুখ প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাজসভায় পাত্র-মিত্র এবং পারিষদবর্গও বেশ খুশি হলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ তিন রাজপুত্র ছোট ভাইয়ের মুখে এই স্পর্ধার কথা শুনে রেগে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, রাজার প্রতিবেশী শত্রু-রাজ্যের এক প্রবল নৃপতি বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, এই রাজ্যকে ভীষণ আক্রমণ করলেন। একে একে তিন দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, বলিষ্ঠ রাজপুত্রই যুদ্ধে হেরে গিয়ে, রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলেন। তখন সেই অবহেলিত খর্বকায় ছোট রাজপুত্র একটা ভীষণ হুংকার দিয়ে রণস্থল প্রকম্পিত করে, শাণিত তরবারি হাতে, অশ্বপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন এবং বীর বিক্রমে শত্রু-সৈন্যকে সুকৌশলে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করলেন। শত্রু-সৈন্য ভয় চকিত হয়ে নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কনিষ্ঠ রাজপুত্র সেই সুযোগে তাদের প্রবল আঘাত করতে লাগল। সে আক্রমণ সহ্য করতে না-পেরে, শত্রু-সৈন্য রণক্ষেত্র ছেড়ে ভয়ে পালাতে শুরু করল। ছোট রাজপুত্র তার সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে, ক্রমাগত শত্রু নিপাতে উত্তেজিত করতে লাগল। দেখতে দেখতে শত্রু-সৈন্য সব নিঃশেষ হয়ে গেল।

যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয়ী ছোট রাজকুমার পিতার কাছে এসে, তাঁর চরণে প্রণাম করে বললে, 'আপনার অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা যা করতে পারেনি, আপনার অনাদৃত কনিষ্ঠপুত্র তা বিধাতার আশীর্বাদে সুসম্পন্ন করেছে, পিতা। আমার সানন্দ প্রণাম নিন।'

মহারাজ সিংহাসন থেকে নেমে এসে, কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে মহাসমাদরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন, 'বৎস! আমি তোমার প্রতি এতদিন অবিচার করেছি। সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি ঠিকই বলেছিলে পুত্র, কেউ জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। দীর্ঘকায় ও রূপবান হলেই বীর হয় না। মানুষ ক্ষুদ্রকায় হলেও, তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। পুরুষের যথার্থ সৌন্দর্য তার রূপ নয় ; তার বল, বীর্য আর সাহসেই সে সবার হৃদয় জয় করে। সুপুরুষ হলেই সে শ্রেষ্ঠ মানুষ হয় না—এ সত্য আমি আজ তোমার কাছেই শিখলুম। বিচক্ষণ ও শক্তিমান মানুষের বিজয়লাভই জগতে স্বাভাবিক। পুত্র, তুমি আমাকে আজ যে বিপদ থেকে উদ্ধার করলে, তার পুরস্কারস্বরূপ তোমাকেই যুবরাজ পদে বরণ করলুম। আমার পরে তুমিই এ-রাজ্যের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে, রাজ্য পরিচালনা করবে। আশীর্বাদ করি, ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন।'

ছোট রাজকুমারের অগ্রজেরা কনিষ্ঠের এই সম্মানে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, ছোট ভাইকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য যখন প্রায় সিদ্ধ হবার উপক্রম, সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে ওদের এক ভগ্নী ভাইদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে, রাজার কর্ণগোচরে নিয়ে এলেন এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা! মহারাজ এ-খবর শুনে অত্যন্ত রেগে উঠলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ নৃপতি। অগ্রজ তিনজনকে ডেকে পাঠিয়ে শুধু তীব্র ভর্ৎসনাই করলেন না, যথোচিত কঠিন শাস্তিও দিলেন তাদের। সাধারণ লোক এই রকম অন্যায় কাজ করলে তাদের যে-রকম দণ্ড দেওয়া উচিত, মহারাজ নিজের অপরাধী পুত্রদের সেই রকমই দণ্ড বিধান করলেন। রাজপুত্র বলে তাদের অপরাধের বিচারে কিছুমাত্র দয়া-দাক্ষিণ্য দেখালেন না। তারতম্যও করলেন না কিছু।

প্রজামণ্ডলী সেই সংবাদ শুনে সমবেত কণ্ঠে মহারাজের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল এবং তাদের শত্রুজয়ী বীর যুবরাজ কনিষ্ঠ পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল।

বিজয়গর্বে পুলকিত ও যুবরাজপদে অভিষিক্ত কনিষ্ঠ রাজকুমার পিতার চরণে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললে, 'আপনার আশীর্বাদই আজ আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, পিতা! আমি যে আপনার হৃদয় জয় করতে পেরেছি, এই আমার পরম লাভ। আপনি আমার ভাইদের অপরাধ মার্জনা করুন—আপনার চরণে এই মিনতি করি। ওরা নির্বোধ। নির্বোধের প্রতি অনুকম্পা করাই মহতের কাজ।'

মহারাজ আনন্দে বিজয়ী পুত্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন, 'তুমি শুধু বীর নও পুত্র! তুমি মহৎ! তোমাকে আজ থেকেই আমি এই সিংহাসন, রাজমুকুট এবং শাসন-দণ্ড দিয়ে, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করব। তুমি আমার পরিবর্তে এই রাজ্যের রাজা হলে। এই শুভদিনে আজই তোমার রাজ্যাভিষেক হবে।'

প্রজারা সেই সংবাদ শুনে আহ্লাদে জয়ধ্বনি দিয়ে, রাজধানী মুখরিত করে তুলল!

ছবি : সত্যজিৎ রায়

পুরনো 'সন্দেশ' থেকে পুরনো 'সন্দেশ' থেকে

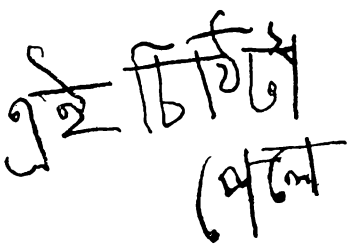

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট মিতুন লিখছে চিঠি
দাদুর কাছে তার,
লিখছে চিঠি দিদার কাছে
মামার কাছে, আর—

যে বোনটা সেই খেলত পুতুল
লিখছে তারই কাছে,
ক'মাস আগের কথা সে আর—
পষ্ট মনে আছে।

বাবার সাথে গিয়ে মিতুন
দিচ্ছে ডাকে ফেলে,
দারুণ খুশি হবে সবাই
এই চিঠিটা পেলে!

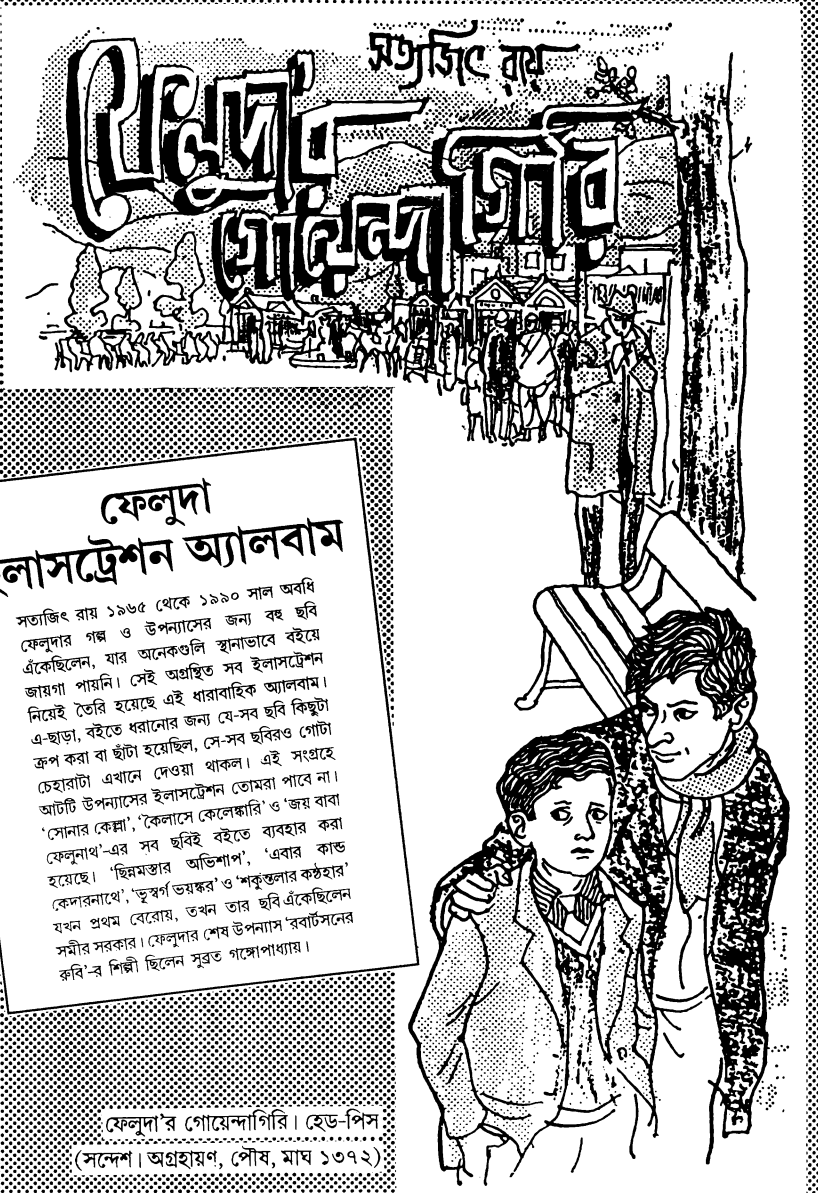

ফেলুদা ইলাসট্রেশন অ্যালবাম

সত্যজিৎ রায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি ফেলুদার গল্প ও উপন্যাসের জন্য বহু ছবি এঁকেছিলেন, যার অনেকগুলি স্থানাভাবে বইয়ে জায়গা পায়নি। সেই অপ্রস্থিত সব ইলাসট্রেশন নিয়েই তৈরি হয়েছে এই ধারাবাহিক অ্যালবাম। এ-ছাড়া, বইতে ধরানোর জন্য যে-সব ছবি কিছুটা ক্রপ করা বা ছাঁটা হয়েছিল, সে-সব ছবিরও গোটা চেহারাটা এখানে দেওয়া থাকল। এই সংগ্রহে আটটি উপন্যাসের ইলাসট্রেশন তোমরা পাবে না। 'সোনার কেল্লা', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর সব ছবিই বইতে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', 'এবার কান্ড কেদারনাথে', 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' ও 'শকুন্তলার কণ্ঠহার' যখন প্রথম বেরোয়, তখন তার ছবি এঁকেছিলেন সমীর সরকার। ফেলুদার শেষ উপন্যাস 'রবার্টসনের রুবি'-র শিল্পী ছিলেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি। হেড-পিস
(সন্দেশ। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ১৩৭২)

গ্যাংটকে গণ্ডগোল
সত্যজিৎ রায়

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। হেড-পিস (দেশ। শারদীয়া ১৩৭৭)

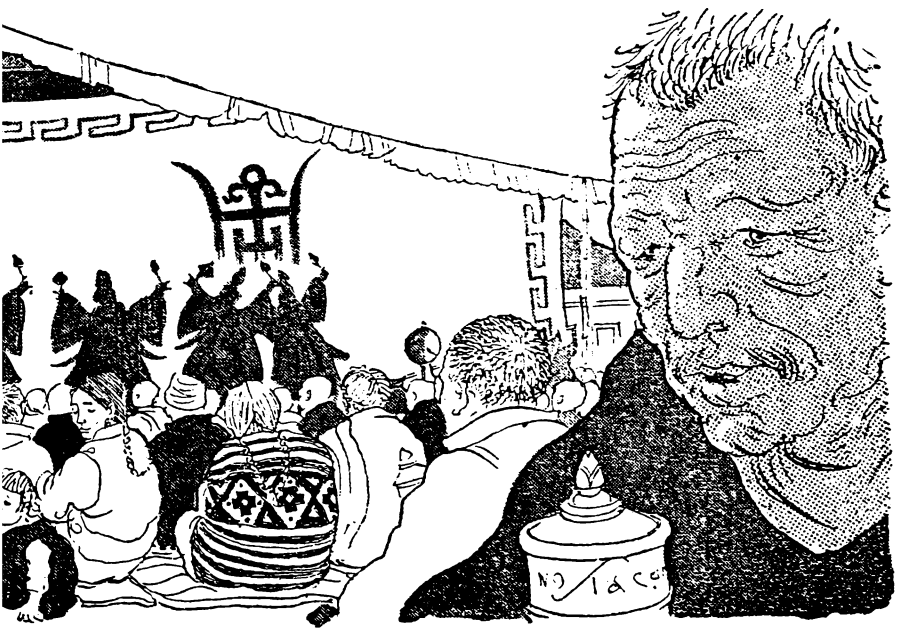

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। 'জীপের পাশে দাঁড়িয়ে হাতটাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে কয়েকজন লোক কি যেন আলোচনা করছে'

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। 'কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একটা ঝলমলে রঙ চোখে পড়ল। এগোতেই বুঝলাম একটা লোক বাহারী পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে'

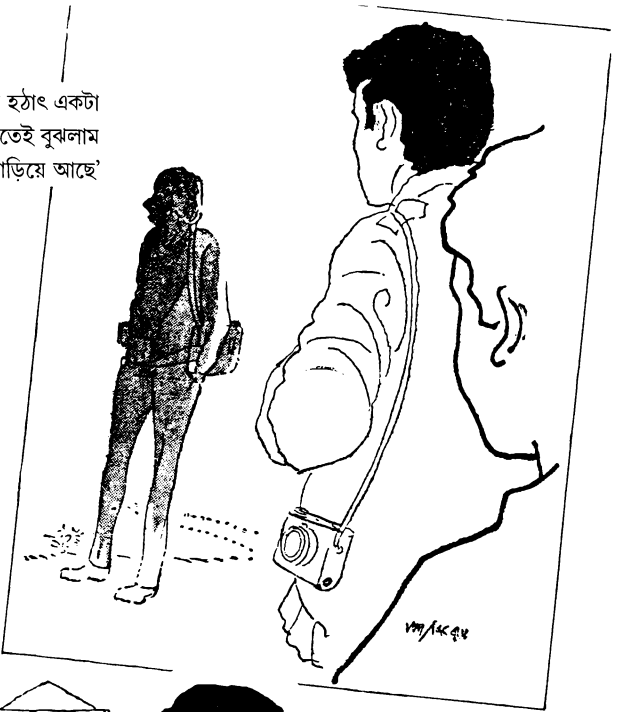

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। 'এর বেস্ট স্পেসিমেন এই কিছুদিন আগে একটি ভদ্রলোক আমাদের দেখাতে এনেছিলেন'

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। 'তোমাদের হাতগুলো উপুর করে টেবিলের উপর রাখ। প্রত্যেকের হাত তার দুপাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই'

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। 'একটা গাছড়াকে আঁকড়ে ধরে ঠিকরে-বেড়িয়ে-আসা চোখ উপরের দিকে করে ঝুলে আছেন নিশিকান্ত সরকার'

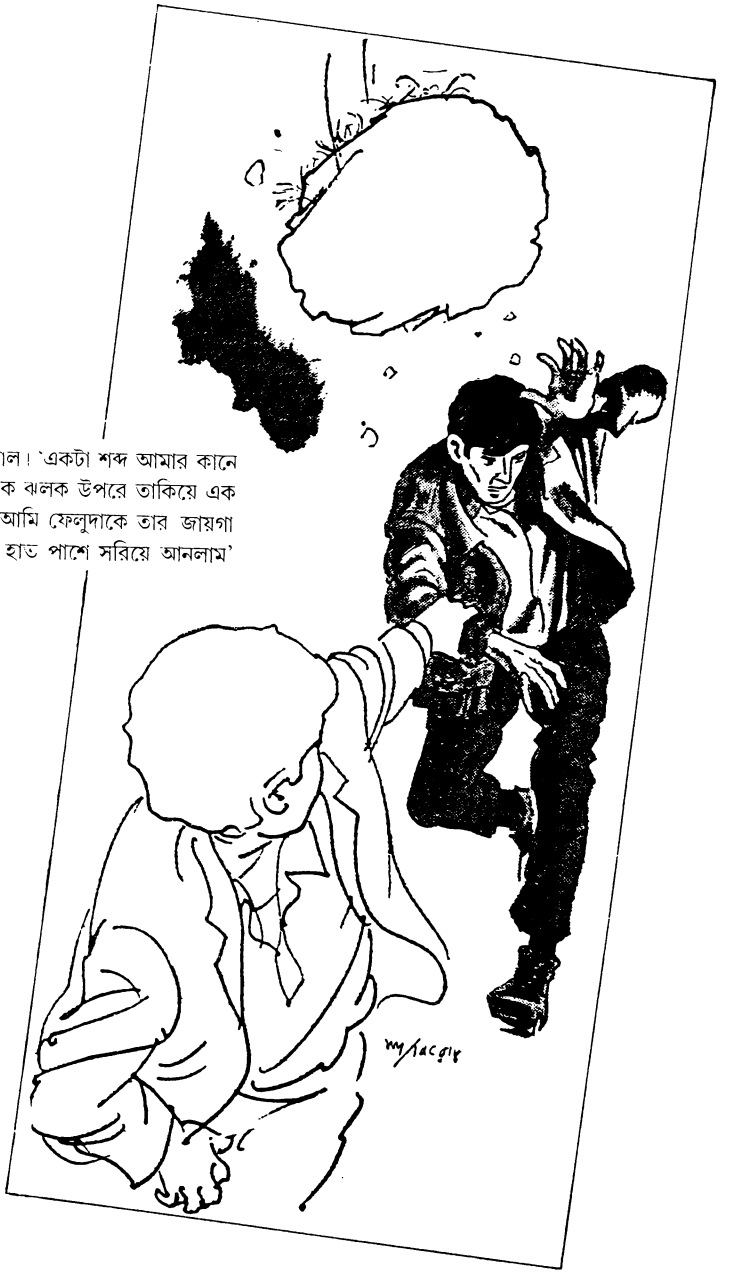

গ্যাংটকে গন্ডগোল। 'একটা শব্দ আমার কানে আসতেই এক ঝলক উপরে তাকিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমি ফেলুদাকে তার জায়গা থেকে তিন হাত পাশে সরিয়ে আনলাম'

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। 'এটা নর্থ সিকিম হাইওয়েতে তোলা।... সরু ফিতের মত রাস্তাটাকে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে দেখা যায়'

গ্যাংটকে গণ্ডগোল। 'ফেলুদা তাকে অগ্রাহ্য করে ছুটল বনের দিকে'

ক্রমশ

সুজয় সোম

মহা দুষ্টু লোকেরা যতই আমাদের নিন্দে করুক, আজও এই বঙ্গদেশে সোনা ফলে। মন আর মগজের অফুরন্ত চাষ হয়। বে-পরোয়া ঘাঁটি বানিয়ে, এখানকার কিশোর ও যুবকরা টইটম্বুর পেকে ওঠে দুটো জায়গায়। না-না, ইশকুল-কলেজে নয়, লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও নাটকের দলে। যেমন ধরো, স্বপ্নের রঙ-চটানো কমিক্‌স-এর বই বা লারে-লাপ্পা স্যাটিলাইট টিভি—কী মজা, গোবেচারা ছেলেপুলেদের মাথা খাবার দায়িত্ব নিয়েছে! কিম্বা দেশ-জুড়ে রঙ-চঙে বজ্জাতরা দুর্নীতির খাল কেটে, আমাদের সব্বাইকে বখাতে চাইছে! এই-সব শত্রুর মোকাবিলা করতে, কাউকে-বা সটাং ঝেড়ে ফেলতে, আহা, রোজকার যুদ্ধের প্যাঁচ-কষা ও অস্ত্র বানানো হয় ওই দু'রকম সেনা-ছাউনিতে। মোট কথা, এই বঙ্গদেশ ছাপিয়ে সারা ভারতে—যেখানেই বাঙালিরা শেকড় গেড়েছে , সব জায়গায় কাঁচা বয়েস থেকেই আমাদের মন আর মগজ পেকে উঠছে। আহ্লাদে গলে যাই—আরেব্বাস্, চারদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে খুদে পত্রিকা এবং গ্রুপ থিয়েটার!

এ-সব সুখের কথা ভাবলেই, মনে পড়ে যায় ডিরোজিওকে। হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। পোর্তুগিজ বংশের ফিরিঙ্গি। খাস্ কলকাতার ছেলে। বঙ্গদেশে কিশোর-তরুণদের অভিনয়-যোগ্য প্রথম নাটকটা লিখেছে ডিরোজিও। তখনও সে ইশকুলের ছাত্র, ১৪ বছর বয়েস। বঙ্গীয় যুবকদের প্রথম লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরিয়েছে হিন্দু কালেজ থেকে। সেই ডাকাবুকো ইংরিজি কাগজ 'পার্থেনন'-এর চৌকোস্ সম্পাদক ছিলেন ডিরোজিও। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রেভারেন্ড লালবিহারী দে কলম ধরার প্রায় ৫০ বছর আগে, ১৮২০ দশকেই, ভারতের গেঁয়ো মানুষদের কাব্য-সাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছেন কবি ডিরোজিও। তাছাড়া ডিরোজিও হলেন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি! তাঁর আগে আর-কোনও কবি ভারতভূমিকে 'মা' বলে ডাকেনি, এই দেশটাকে 'স্বদেশ' বলে গলে যায়নি!

হিন্দু কালেজ মানে আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজ। সেই হিন্দু কালেজে স্রেফ পাঁচ বছর মাস্টারি করেছেন ডিরোজিও। ইংরিজি সাহিত্য আর ইতিহাসের ক্লাসে অমন টইটম্বুর সরসতা এবং স্বাধীন ভাবনা-চিন্তার উস্‌কানিতে, নিতান্ত ছোক্‌রা বয়েসেই তাঁর ছাত্ররা খোলা মনে ও জোর গলায় কথা বলতে পেলো। রাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস, অর্থনীতি, কিম্বা দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সব ব্যাপারে। মতামতটা যেন ধারালো যুক্তি আর খাঁটি সত্যের মজবুত ঠেকোতে দাঁড়িয়ে থাকে, তা সে বক্তার বয়েস, ধর্ম, শ্রেণী বা পেশা যা-ই হোক। যুক্তির খুঁটি বেয়ে সত্যে পৌঁছতে হবে। ডিরোজিও জানতেন—ছেলেপুলেদের মনের আরশিতে

নিয়ম-শৃঙ্খলার জ্ঞান, আত্মসংযম বা নীতিবোধ না-গজালে, মহা বিপদ! মোট কথা, হিন্দু কালেজের বাগান বা ক্লাস-ঘর ছাপিয়ে, ডিরোজিওর মৌলালির বাড়িটাও টগ্‌বগে বিতর্ক-সভা বনে গেল! জানিস, মানুষের জন্য দরদ, স্নেহ, মমতা—যাকে বলে মানবপ্রেম, যার উৎস অফুরন্ত স্বদেশপ্রেমের মধ্যে—ডিরোজিওর মনের ভেতর থেকে উপ্‌চে পড়ত! অবিশ্যি ডিরোজিওর সেরা অস্ত্র বলতে তাঁর মগজ, কী গন্‌গনে বুদ্ধি!

কলকাতার ছাত্রদের চিরকেলে বিদ্রোহী বানিয়ে গেছেন ডিরোজিও। আহা, ছাত্রদের বুকের মধ্যে পুঁতে দিলেন নতুন জীবনের মন্ত্র। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে গেল! তার ঢেউ হিন্দু কালেজ থেকে আছড়ে পড়ল গোটা বঙ্গদেশে। রোমাঞ্চকর সামাজিক বিপ্লবের পত্তন হলো!

রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের প্রতিষ্ঠাতা। আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারার জনক। দেশের লোকের কানে স্বাধীন হবার প্রথম মন্ত্র জুগিয়েছেন। সেদিন তাঁর-ই নেতৃত্বে গোটা দেশ জেগে উঠেছে। সামাজিক জীবন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রুচি ও মূল্যবোধ, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম, জাতীয়তাবোধ—সবেতেই নতুন চেতনার বান এলো। ওই সময়টাই হলো রঙ-চটা, অ-কেজো দেয়াল ভেঙে ফেলে, বুদ্ধির আলোতে উজ্জ্বল, আধুনিক জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠা করার যুগ। চিন্তা-জগতের নব-জাগরণ। বঙ্গীয় রেনেসাঁস। তারপর বাঙালি-মনের সেই প্রভাব হৈহৈ করে ছড়িয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষে!

ওই নব-যুগের শুরুর সময়টা হলো ১৯ শতকের দ্বিতীয় দশক। সে-সময়ে ওরকম ভয়-শূন্য, বলিষ্ঠ পুরুষ কয়েকজন না-জন্মালে, গোটা দেশটার ব্যক্তিত্ব স্রেফ কাদা ও ধুলোর মধ্যে লুটোপুটি খেতো! রামমোহন রায় ছাড়াও সেই পালা-বদলের নায়কদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন,

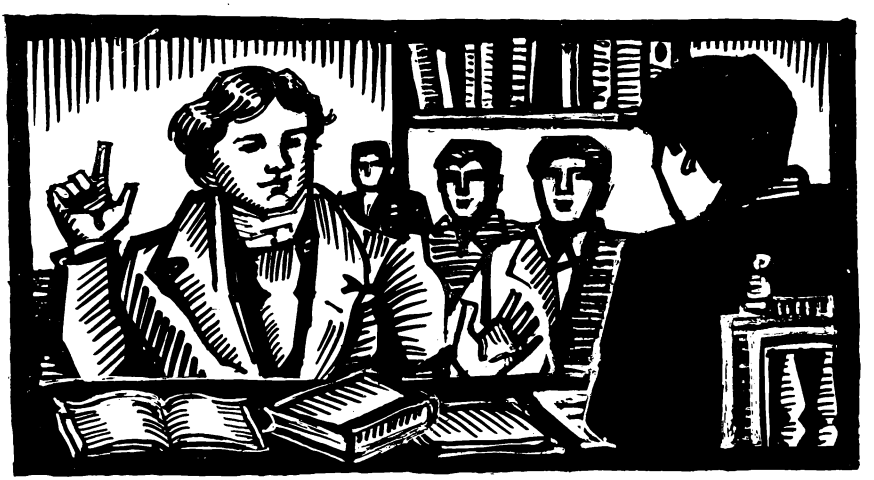

শিবনাথ শাস্ত্রী। তখন নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন আমাদের ভিন্-দেশি বন্ধুরাও! ডেভিড হেয়ার, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, আলেকজান্ডার ডাফ্। ডিরোজিও অবিশ্যি খাস্ কলকাতার ছেলে!

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, ডিরোজিওর আদর্শ এবং চেতনার খুঁটি বলতে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব। আর ১৯ শতকের বঙ্গীয় নব-জাগরণের পটভূমি ছিল উত্তর কলকাতা। মৌলালি থেকে জোড়াসাঁকো থেকে বরানগর। এটা মনে রাখিস, শিল্প-বিপ্লব আর ফরাসি বিপ্লবের স্রোতেই, ১৮ শতকের ইয়োরোপে আধুনিক জীবন-চেতনার বান ডেকেছিল। চিন্তা-জগতের নব-জাগরণ। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস! ফরাসি বিপ্লবের মূল বাণী—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা!

ডিরোজিওর ছাত্র-দলের নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। এ-দেশের ছাত্ররা সেই প্রথম গোটা মানুষ হিসেবে, সটাং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেলো। দিব্যি স্বাধীন-চেতা, টগ্‌বগে ব্যক্তিত্ব! ডিরোজিওর ছাত্রদের হাতে ছিল দুটো সাংঘাতিক অস্ত্র , বিদ্যে আর জ্ঞান! ওরা সত্যের বন্ধু, মিথ্যের শত্রু! জোট-বেঁধে যাবতীয় কু-সংস্কার, দুর্নীতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সামাজিক অনাচারের প্রতিবাদ করার বে-পরোয়া শক্তি ও সাহস—সেই প্রথম সঞ্চারিত হলো ভারতবর্ষের ছাত্রদের মধ্যে। এ-দেশের ছাপোষা, সাধারণ লোকেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় উস্‌কে দিতে, ডিরোজিওর দলবল উঠে-পড়ে লাগল। প্রায় ১৭০ বছর আগে, সেই হিন্দু কালেজের আমল থেকেই, বঙ্গদেশের ছাত্র আর যুবকরা নীতি-নিষ্ঠ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট-এর ভিৎ বলতে চিন্তার মুক্তি ও স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, মানবিকতা, সত্য-নিষ্ঠা এবং যুক্তিবাদ।

আধুনিক সভ্যতার স্বপ্ন ঈগল পাখির মতো ডানা মেলল গোটা ভারতবর্ষে। আমাদের বঙ্গদেশে গজালো ডিরোজিও-পরবর্তী দেড়শো বছরের যাবতীয় ছাত্র-আন্দোলনের বীজ। ১৮২০ দশকের ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট থেকে ১৯৬০ দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন পর্যন্ত!

ডিরোজিও বলতেন, চেষ্টা করলে যে-কোনও মানুষ বা জাতি উন্নতি করতে পারে—এই বিশ্বাসটুকু আমাদের বুকের মধ্যে পুষতে হবে। বিজ্ঞান-চেতনা ও বুদ্ধি দিয়ে, ন্যায্য যুক্তি মেনে, বাস্তব-জীবনে আমরা যা-কিছু করতে পারি, সেটাই ধ্রুব-সত্য। সবরকম মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, প্রকৃতি ও সমাজকে পাল্টে দেবার সামর্থ আমাদের আছে।... ঠিক এ-জাতের স্বপ্নকেই বুকের মধ্যে পুষে, আজও দিব্যি মন আর মগজের অফুরন্ত চাষ হচ্ছে এই বঙ্গদেশে। আর-কোত্থাও ততটা নয়, যতটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন আর গ্রুপ থিয়েটারে! এই উর্বরা মাটিতে সোনা ফলাবার চাষ! সমাজের শত্রুদের বেমালুম নিকেশ করতে, গেরিলা যুদ্ধের প্যাঁচ-কষা এবং জোরালো অস্ত্র বানাবার, আহা, এক-একটা সাংঘাতিক ঘাঁটি!

আজকের সভ্য সমাজের কিছু পাজি লোকের গা-ঘিন্‌ঘিনে আসল চেহারাটা কেমন, সেটা 'গণশত্রু' ছবিতে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়! সেই হাড় বজ্জাতির দাপটে, সত্য-নিষ্ঠ আর যুক্তিবাদী ডাক্তার অশোক গুপ্ত যখন মহা ফাঁপরে পড়লেন, ধোপা-নাপিত বন্ধ, পায়ের তলা থেকে সব মাটি খসে গেল, শেষপর্যন্ত ওই একা লোকটার পাশে দাঁড়াল কারা? 'মশাল' নামে একটা ত্রৈমাসিক খুদে পত্রিকা এবং সেই কাগজের সঙ্গে জড়িত যুবকদের নিয়ে বেড়ে-ওঠা নাটকের দল!

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

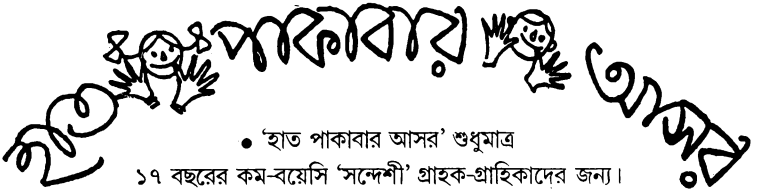

• 'হাত পাকাবার আসর' শুধুমাত্র
১৭ বছরের কম-বয়েসি 'সন্দেশী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য।
• 'সন্দেশ'-সম্পাদকদের পছন্দ অনুযায়ী গল্প, ছড়া ও কবিতা,
ছবি, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, ধাঁধা ইত্যাদি সবকিছুই ছাপানো হয়।
• ছাপার জন্য যে-কোনও লেখা কাগজের একদিকে পরিষ্কার করে লিখবে।
• ছবি আঁকতে হলে শুধুমাত্র কালো কালি ব্যবহার করবে।
• যে-সব স্কুল, ক্লাব ও লাইব্রেরি 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক,
সেখানকার সমস্ত ছাত্র বা সদস্য 'হাত পাকাবার
আসর'-এর জন্য ছবি ও লেখা পাঠাতে পারো।
• সব লেখা ও ছবির সঙ্গে তোমার নাম,
গ্রাহক নম্বর ও বয়েস স্পষ্ট
করে লিখবে।

ভোরের শান্তিনিকেতন

শিঞ্জিনী দাশগুপ্ত
গ্রাহক সংখ্যা ১৬১৬। বয়স ১১ বছর

ভোরের শান্তিনিকেতন আমার খুব ভাল লাগে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে শান্তিনিকেতনকে দেখলে ঘুমন্তপুরী মনে হয়। তখনও সূর্য ওঠেনি, আকাশ সবে একটু লাল হয়েছে। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে শুনি কি সুন্দর একটা পাখির ডাক। এরকম ডাক বেশি শোনা যায় না। এই ঘুমন্তপুরীর মধ্যে হঠাৎ এই আশ্চর্য ডাক ধ্বনিত হয়ে চারদিকে মুখরিত হয়ে উঠেছে। একটু বাদেই পাখিটা উড়ে গেল। আস্তে আস্তে রোদ উঠল, শরতের সোনার রোদ গাছের গায়ে পড়ায় ঝক্‌মক্ করতে লাগল। সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। নানা মাসে নানা ঋতুতে ভোরের শান্তিনিকেতন নানান রূপে সাজে। যেমন গ্রীষ্মকালে সব গাছপালা এমনভাবে থাকে যে মনে হয় কেউ এটাকে মায়াবলে মায়াপুরী করে রেখেছে। বর্ষাকালে আবার নতুন সাজে সেজে, কচিপাতা ফুলে ভর্তি থাকে, শরৎকালে তার সোনার রোদে গাছপালা ঝক্‌মক্ করে। ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা তুলোর মত মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। আবার শীতকালে হিমেল হাওয়া ঘর থেকে বেরোতে দেয় না। তখন এই ভোরে আশ্রমকে দেখলে মনে হয় এখানে মজা নেই, সব নিস্তেজ, না আছে পাখির ডাক না আছে কিছু। বসন্ত কালে আবার সব পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোকিলের কুহুকুহু ডাকে মুখর হয়ে ওঠে। আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনে এসে ভোরের শান্তিনিকেতনকে মন দিয়ে না দেখলে কিছুই দেখা হয় না।

কলকাতায় এসে

সুপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়
গ্রাহক সংখ্যা ৯১৮। বয়স ৮ বছর

কলকাতা এসে দেখি,
বড় বড় বাড়ি।
চমকে গেলাম আমি,
দেখে ট্রাম গাড়ি!
হাওড়ার পুল দেখে,
মাথা ঘুরে গেল!
মনুমেন্ট দেখে মোর,
ভারী ভয় হল।
ঘাড়ে যদি দুম করে,
পড়ে আড়াআড়ি!
মাথা হবে ফুটিফাটা
ফিরব না বাড়ি।

ভূত

অপরাজিতা দাশগুপ্ত
গ্রাহক সংখ্যা ২৩৯২। ৬ বছর ৬ মাস

ভূত তো আছে — আছেই,
আমার কাছে — কাছেই,
সন্ধে হলেই খায় গপাগপ্
গাছের পাকা ফল—
ভূত আছে তা জানে না,
ছোড়দা কিছুই মানে না,
ও বলে কি, ভূত নয়রে—
পাড়ার ছেলের দল
খায়রে পাকা ফল।
আমি কিন্তু মানি না।

আমার দেখা ভেনিস

রাকা দাশগুপ্ত
গ্রাহক নং ১৩৩৭। বয়স ১২ বছর

তখন আমি পড়ি ক্লাস ওয়ানে। হঠাৎ বিদেশ যাওয়ার সুযোগ এসে গেল। বাবাকে কাজের জন্য যেতে হল সুদূর ইটালিতে। সঙ্গে গেলাম আমি আর মা।

দিল্লি থেকে বাবা, মা আমি এবং আরও অনেক যাত্রীকে নিয়ে বিরাট এক প্লেন ছাড়ল সকাল এগারোটার সময়।

জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখি, আবার কী কাণ্ড! ঘরবাড়িগুলো ছোট হতে হতে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে মেঘগুলোও নিচে নেমে গেল। বাইরে আর কিছুই দেখা গেলনা। এইভাবে কয়েক ঘন্টা চলার পর শেষ পর্যন্ত যখন রোমে পৌঁছলাম, ভারি আনন্দ হচ্ছিল। বাবার ঘড়িতে দেখলাম সন্ধে সাতটা। প্লেন থেকে নামলাম। নেমেই দেখি এয়ারপোর্টের ঘড়িতে বাজে তিনটে। তখন দুপুর।

আমরা ইটালিতে মোট একবছর ছিলাম। সেইসময় আমরা নানা জায়গায় ঘুরেছি। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ভেনিস, ইটালিয়ান ভাষায় যাকে বলে 'ভেনিৎসিয়া'।

একদিন ভোরবেলা আমরা ভেনিসের ট্রেনে চড়লাম। চললাম আমার স্বপ্নের শহরের উদ্দেশে। ইটালির ট্রেনগুলো খুব সুন্দর, ঝকঝকে-তকতকে হয়। ভেনিস যাওয়ার ট্রেনটিও খুব সুন্দর ছিল। অন্যান্য ট্রেনগুলোর মত এটারও বসার

জায়গাগুলো ছিল চেয়ারের মতন। তাতে আবার সোফার মত নরম গদি। ওগুলো টানলে এত বড় হয়ে যায় যে একজন লোক অনায়াসে শুতে পারে। দেওয়ালে রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক ছবি আর বড় বড় আয়না। জানলায় ঝুলছে ঝলমলে রঙবেরঙের পর্দা। মনে হচ্ছিল কোনো বাড়ির সাজানো গোছানো ড্রয়িংরুমে বসে রয়েছি।

ভেনিস শহরটা দ্বীপের মতো, তার চারদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। একটি ব্রিজ দিয়ে ইটালির মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। আড়াই মাইল লম্বা সেই ব্রিজ দিয়ে যখন আমাদের ট্রেনটা যাচ্ছিল, কী দারুণই না লাগছিল। যেদিকে তাকাই কেবল জল আর জল। মাঝখানের ব্রিজ দিয়ে আমরা চলেছি। ভাবছিলাম, যাত্রাপথের সৌন্দর্যই যখন এমন, তখন ভেনিস না জানি কত সুন্দর।

অবশেষে পৌঁছলাম ভেনিসে। যেখানে আমরা উঠলাম সেটা 'নান্'দের একটা কনভেন্ট। আমরা সেখানে যেতেই কয়েকজন নান্ এগিয়ে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। আমরা মুগ্ধ। ওঁদের ব্যবহার এত ভালো যে, মনে হচ্ছিল আপনজনের বাড়িতে এসেছি। দেখামাত্রই যেন আপন করে নিলেন। যে ঘরটায় আমাদের থাকতে দেওয়া হল, সেখান থেকে সমুদ্রও দেখা যেত।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা বেরোলাম শহরটা দেখতে। এখানে কোনরকম গাড়ি চলে না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে হয় স্টিমার বা নৌকোয় করে জলপথে, নাহলে হেঁটে পায়ে চলার পথ দিয়ে যেতে হয়। শহরটাতে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় খাল। সেই সব খাল পার হবার জন্য আছে বহু ব্রিজ। মাঝমাঝেই খালের মধ্যে দিয়ে চলছে ভেনিসের বিখ্যাত নৌকো 'গণ্ডোলা'।

গণ্ডোলা হচ্ছে কারুকার্য করা ও সুন্দরভাবে সাজানো এক ধরনের নৌকো। শুনেছি, ভেনিসে এসে এই গণ্ডোলার মাঝিদের গান শুনে আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাদের গানের সুরে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গান 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী'। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ছেলেমেয়েরা সব স্কুল থেকে ফিরছে স্টিমার করে। বড়রাও তাদের কাজে যাচ্ছেন স্টিমারে বা নৌকোয় করে। আমাদের দেশে যেমন রাস্তার দুপাশে বাড়ি, ভেনিসে তেমনই খালের দুপাশে বাড়ি। কোথাও কোথাও এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাবার জন্য এক বাড়ির বারান্দা থেকে অন্য বাড়ির বারান্দায় খালের ওপর দিয়ে চলে গেছে সেতু। অনেক বাড়ির সিঁড়ির শেষ ধাপগুলি জলে নেমে গেছে আর বাড়ির সামনে বাঁধা রয়েছে নৌকো। ভেনিসের একটা খুব মজার ব্যাপার দেখলাম, ওখানকার বাড়ির নম্বরগুলো এলোমেলো। একটা বাড়ির নম্বর ৭১ হলে পরের বাড়ির নম্বর হয়তো ৫৬৮।

পরদিন আমরা গেলাম 'পিয়াৎসা সান্ মার্কো'তে। অনেক বড় খোলা জায়গাকে ইটালিতে 'পিয়াৎসা' বলা হয়। আর সান মার্কো হচ্ছে পিয়াৎসাটার নাম। ঢাকা বারান্দা দিয়ে জায়গাটার তিনদিক ঘেরা। আর সেই বারান্দায় রয়েছে অজস্র দোকান। খাবার দাবার কাপড়জামা থেকে শুরু করে কাচের তৈরি নানান জিনিসের দোকান, কিছুই বাদ নেই। ভেনিসের লেস ও কাচের জিনিস বিশ্ববিখ্যাত।

পিয়াৎসাটার একপাশে রয়েছে একটা ঘড়িঘর। তার দেওয়ালে আছে প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি। ছাদে আবার ব্রোঞ্জের তৈরি দুটো মূর্তি আর একটা ঘণ্টা রয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় মূর্তি দুটো ঘণ্টাটা বাজায়। সান্ মার্কোতে একটা গির্জাও আছে। এখানে যিশুর একজন প্রধান শিষ্য 'সান মার্কো' বা সেণ্ট মার্কের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। তাঁরই নামে পিয়াৎসাটার নাম হয়েছে সান্ মার্কো। এছাড়া এখানে আছে একটা উঁচু টাওয়ার বা ঘণ্টাঘর। এর ভেতরে একটা ঘণ্টা আছে, সেটা পনেরো মিনিট পরপর বাজে। ভেনিসে এসে যা কিছু ভাল জিনিস দেখেছিলাম, বাবার ক্যামেরা সব ধরে রেখেছে। সমুদ্র থেকে শুরু করে সান মার্কোর টাওয়ার পর্যন্ত কিছুই তার চোখ এড়ায়নি।

ভেনিসের আরও দুটো দ্রষ্টব্য জিনিস ডিউকের বিশাল প্রাসাদ আর দীর্ঘশ্বাস সেতু। ডিউকের প্রাসাদটা এখানকার এক প্রাচীন ডিউকের জমকালো প্রকাণ্ড বাসগৃহ। দীর্ঘশ্বাসের সেতু হলো একটি খালের ওপর অবস্থিত এক সেতু, যেখান দিয়ে প্রাচীনকালে বন্দিদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হত। সেই বন্দিরা আর কোনওদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পেত না। তাই হতভাগ্যরা সেতুর ওপারের কারাগারে যেত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে। তাই সেতুটির এই নাম।

পরে বাবার কাছে জেনেছিলাম ভেনিস শহরে নাকি প্রায় ১৫০টি ছোট-বড় খাল আছে। বলতে গেলে এগুলোই ভেনিসের রাস্তা। এইসব খালের উপর আছে প্রায় ৪০০টি সেতু। আর এই খালগুলিই শহরটিকে ১১৭টি টুকরো বা দ্বীপে ভাগ করেছে।

ভেনিসে আমরা মাত্র দুদিন ছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই আমি এই সুন্দর, বৈচিত্র্যময় শহরটিকে এত ভালোবেসে ফেলছিলাম যে, তাকে ছেড়ে আসতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

সেবন্তী সেনগুপ্ত
গ্রাহক সংখ্যা ৩০০৩। বয়স ৮ বছর

রবি-কবি

অস্মিতা সরকার
গ্রাহক নং ২২০২। ১১ বছর ৪ মাস

সকাল বেলা ঘুম ভাঙে মোর
রবির গানের সুরে,
সারাটা দিন বাজে সে গান
আমার প্রাণটি জুড়ে।
শুধুই কি গান, কত ছবি
তোমার হাতের টানে—
সে সব ছবি দোলা লাগায়
আমার নরম প্রাণে।
আমার বইয়ের তাকটি জুড়ে
তোমার কত গল্প,
প্রণাম তোমায় রবি-কবি
গুণ কি তোমার অল্প?

ভূমিকম্প

শৌভ চট্টোপাধ্যায়
গ্রাহক সংখ্যা ২১৫৭। বয়স ১০ বছর

ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!
নিদারুণ আগ্রাসী,
মহারাষ্ট্রে সে হেসে গেল তার
প্রলয়ঙ্কর হাসি।
ভেঙে পড়েছিল কত ঘরবাড়ি,
মারা গিয়েছিল কত নরনারী,
মূক পশুপাখি জানিয়েছিল তো
ভূমিকম্পের খবর!
মানুষ সে কথা বোঝেনি তো, তাই
হল জীবন্ত কবর।

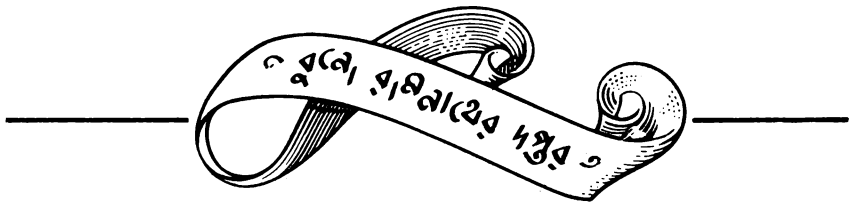

গয়া থেকে গোয়া

আমরা যে ভাবে দ্যাখ্-এর দ্যা উচ্চারণ করি, বুবুতান সেইভাবে জোরে জোরে পড়ছিল, বি-দ্যা-ভ্যা-স। আমি বললাম, 'উচ্চারণ-ওরকম হবে না বুবুতান। পড়ো, বিদ্‌দ্যাভ্ ভ্যাস।'

P-U-T পুট হলে B-U-T বাট হয় কী করে, সেই জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল বুবুতান। শিশুরা সব কিছু একটা সূত্রের মধ্যে ফেলতেই অভ্যস্থ। ব্যতিক্রমের কথা বলতে আমারও ভালো লাগত না।

আসলে ভাষা তো অঙ্ক নয়। এই যেমন, আমরা য-ফলা আকারের যে উচ্চারণ করি, সংস্কৃতে সেরকম নয়। হিন্দীতেও নয়। বিদ্যার উচ্চারণ সেখানে বিদিয়া। আচার্য হল আচারিয়া। হিন্দীতে ঐ-কার উচ্চারিত হয় অ্যাই। সেটাই ব্যবহার হয় অ্যা উচ্চারণ করতে। তাই হিন্দীতে 'মৈ' উচ্চারণ হবে 'ম্যাই'— আমাদের গাছে তোলার মই নয়। 'হৈ' উচ্চারণ করতে অতো হৈ হৈ করার দরকার নেই। 'হ্যাই' বলতে হবে। ব্যাংক লেখা হয় বৈংক।

হিন্দীর কথা থাক। আমাদের বাংলা ভাষাতে অনেক সময় যেরকম লেখা হয়, উচ্চারণ সেরকম হয় না। য়া-র উচ্চারণ হয় ইয়া। 'য়া' দিয়ে সুরু করা শব্দের প্রচলন বাংলাতে নেই বলে ওটাকে লেখা হয় 'ইয়া'। সন্দেশএকটা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে একটা চরিত্রের নাম ছিল য়াগা (yaga)। ছোটরা এভাবে পড়তে অভ্যস্ত নয় বলে সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ওটাকে করেছিলেন ইয়াগা—অবশ্য লেখিকার মত নিয়েই। শব্দের মাঝখানে অ আর আ লেখার রেওয়াজ বাংলাতে নেই। তবুও যেখানে উচ্চারণে গোলমালের সম্ভাবনা আছে, সেখানে ওটা চালু করলে আপত্তি নেই। ড্রয়ারকে (drawer) গয়ার মতন উচ্চারণ করতে দেখে আমি নিজেই আমার একটা গল্পে ড্রআর লিখেছিলাম। সম্পাদক সত্যজিৎ রায় অনুমোদন করেছিলেন।

ও-কারের পরে য়া থাকলে তার উচ্চারণ আবার আ হয় বাংলা ভাষায়। যেমন, গোয়া গিয়ে মোয়া খেলাম। গয়লা হয়ে গেল গোয়ালা। হিন্দীতে কিন্তু তা হয় না। তাই খোয়া ক্ষীর হিন্দী উচ্চারণে খোইয়া শুনতে লাগে।

সংস্কৃতের মতন হিন্দীতেও অন্তঃস্থ-য আর অন্তঃস্থ-য় আলাদা নয়। জ্ঞ-কেও আমাদের মতন গ্যঁ উচ্চারণ না করে হিন্দীতে গ্ন উচ্চারিত হয়। তাই যাজ্ঞিককে উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলাতেও অনেক সময় ইয়াগ্‌নিক লিখতে দেখেছি। সূর্য ট্রেডমার্কের কোনো জিনিসকে বিজ্ঞাপনে বাংলা হরপে সুরাইয়্যা ছাপতে দেখেছি।

আসলে লেখা যেভাবেই থাক, দরকার অনুযায়ী উচ্চারণ করাটাই ঠিক। লেখা থাক না যাজ্ঞিক, এই-অবঙ্গীয় পদবী পড়ার সময় জাগ্যিক না বলে য়াগ্‌নিক বললেই হল। কে আর কেমন দুটোতে 'কে'-র উচ্চারণ তো আলাদাই করি।

তবে কতকগুলো জায়গায় একই বানানের যদি তৎসম শব্দ আর দেশজ শব্দ থাকে, তখন দেশজ

শব্দটাকে উচ্চারণ অনুযায়ী লেখাটাই ঠিক। সন্দেশ সম্পাদিকা লীলা মজুমদার আমাকে তাই বলেছিলেন। যেমন,

বার	—	সপ্তাহের দিন।
বারো	—	ডজন।
কাল	—	সময়।
কালো	—	কৃষ্ণবর্ণ।
ভাল	—	কপাল।
ভালো	—	উত্তম।
মত	—	অভিমত।
মতো	—	সদৃশ।

বুবুতান বিদ্যাভ্যাস করতে করতে বাইরে স্কুলের বন্ধু শ্যামলীর গলা শুনে বই সরিয়ে বলল, 'বাবা, শ্যামলী এসেছে। বাকিটা পরে পড়ব। এখন আর পড়তে ভাল্ লাগছে না।'

বুঝলাম, ভালো শব্দটাকেও বিরক্তি অর্থে কখনো সখনো তৎসম উচ্চারণ করা যেতে পারে।

শব্দ জব্দ

রাজশ্রী রাহা

গত সংখ্যার সমাধান

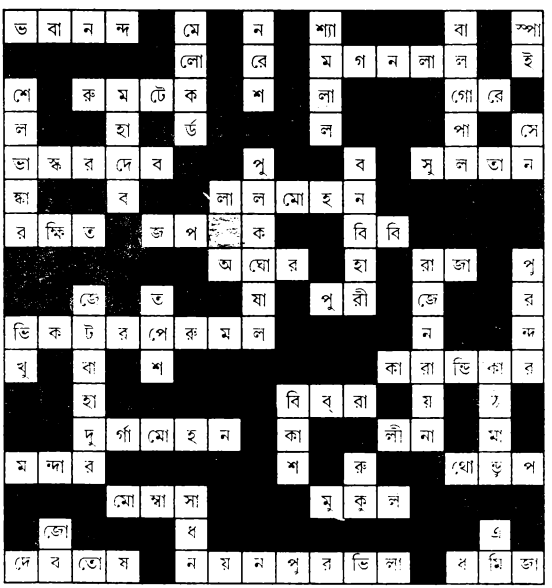

গ্রামীন দরিদ্রদের পারিবারিক আয় বাড়াতে সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প

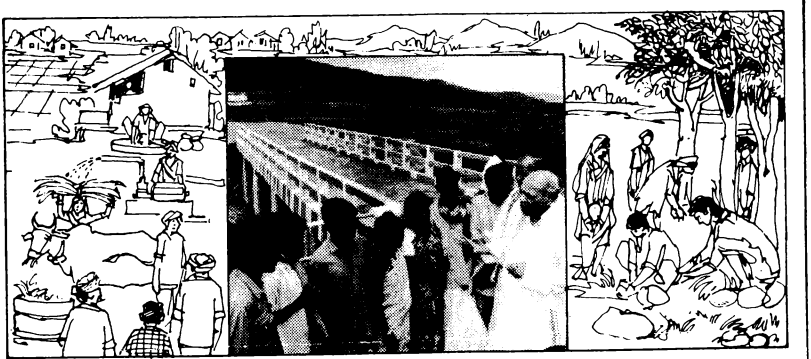

উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় একটি সেতু নির্মাণের কাজে নিয়োজিত কর্মীরা প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি. ভি. নরসিংহ রাওকে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এরা সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পের সুবিধাভোগকারী।

* এই প্রকল্পে চাষের শুখা মরশুমে কাজের খোঁজে বেরুন প্রতিটি গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের দু জন সদস্যের জন্য ১০০ দিনের সুনিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।
* এই প্রকল্প পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নূন্যতম ও সমান মজুরী দেওয়া সুনিশ্চিত করে।
* এই প্রকল্প দেশের মরুপ্রবণ, আদিবাসী অধ্যুসিত, পার্বত্য, খরা ও বন্যাপ্রবণ ২৪৭০টি পশ্চাতপর ব্লকে চালু আছে।

সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ গ্রামের লোক নাম নথিভুক্ত করিয়েছ। ১৯৯৩ এর অক্টোবরে এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৫ কোটিরও বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে।

* **গ্রামীন দরিদ্রদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প একটি কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প।**

এই প্রকল্প সম্বন্ধে আরও জানতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েৎ বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গ্রামীন এলাকা ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়,
ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

davp 95/531

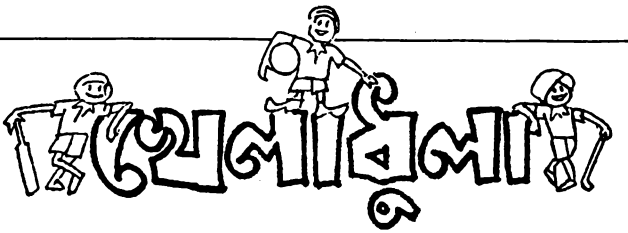

বিশ্বকাপের টুকরো খবর

প্রসাদরঞ্জন রায়

প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয় ১৯৭৫ সালের ৭ জুন। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বিশ্বকাপের খেলা শুরু হয় ৯ জুন। চতুর্থ বিশ্বকাপের খেলা আরম্ভ হয় পাকিস্তানে, ৮ অক্টোবর ১৯৮৭। পঞ্চম বিশ্বকাপের খেলা আরম্ভ হয় নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায়, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। এবারেও (১৯৯৬) খেলা আরম্ভ ফেব্রুয়ারি মাসে, ১১ তারিখে।

• প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বকাপে আটটা করে দল খেলেছে, ম্যাচ ছিল ১৫টা। তৃতীয় ও চতুর্থ বিশ্বকাপে আটটা দল খেললেও, লীগের রিটার্ন ম্যাচ ধরে ২৭টা ম্যাচ খেলা হয়। পঞ্চম বিশ্বকাপে ছিল ন'টা দল, ৩৯টা ম্যাচ।

• এ-পর্যন্ত বিশ্বকাপে পরিত্যক্ত হয়েছে তিনটে ম্যাচ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম শ্রীলঙ্কা। ওভাল ১৯৭৯ (একটা বলও খেলা হয়নি) ॥ পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ১৯৯২ ॥ ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা। ম্যাকে ১৯৯২। আর-সব ম্যাচেই জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়েছে।

• বিশ্বকাপে সেরা রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের : দু'বার চ্যাম্পিয়ন, একবার রানার্স-আপ। ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান একবার করে চ্যাম্পিয়ন। ইংল্যান্ড তিনবার ফাইনালে উঠেও, জেতার সুযোগ পায়নি একবারও!

• অন্য হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (জয় ২২, পরাজয় ৯, পরিত্যক্ত ১) আর ইংল্যান্ড (জয় ২৩, পরাজয় ১০, পরিত্যক্ত ১) প্রায় সমান-সমান। দুর্বলতম দল ক্যানাডা ও পূর্ব অ্যাফ্রিকা তিনটে ম্যাচেই পরাজিত!

একই বিশ্বকাপে দুটো সেঞ্চুরি করেছেন টার্নার (১৯৭৫), মার্শ (১৯৮৭), রামিজ (১৯৯২)। একই বিশ্বকাপে পাঁচটা অর্ধশতরান : বুন (১৯৮৭), জাভেদ (১৯৯২), ক্রো (১৯৯২)।

• বৃহত্তম জুটি : ১৮২, ম্যাককস্কার ও টার্নার, বনাম শ্রীলঙ্কা, ওভাল ১৯৭৫।

• মোট সর্বাধিক উইকেট নিয়েছেন ইমরান (৩৪)। তাঁর পরে আছেন বথ (৩০), কপিল (২৮), রবার্টস ও ম্যাকডারমট (২৬), ওয়াসিম আক্রম (২৫)।

• এক ম্যাচে সেরা বোলিং : উইনস্টন ডেভিস (৭-৫১) বনাম অস্ট্রেলিয়া, লীডস্ ১৯৮৩। গেরি গিল্‌মোর (৬-১৪) বনাম ইংল্যান্ড, লীডস্ ১৯৭৫। কেন্ ম্যাকলিয়ে (৬-৩৯) বনাম ভারত, নটিংহাম ১৯৮৩।

• এক ইনিংসে ৩ উইকেট ৫ বার নিয়েছেন ইমরান, আব্দুল কাদির ও মদনলাল।

• এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট : ১৮, রজার বিনি (১৯৮৩), ম্যাকডারমট (১৯৮৭), ওয়াসিম আক্রম (১৯৯২)।

• বিশ্বকাপে হ্যাট্রিক করেছেন একজনই। চেতন শর্মা, বনাম নিউজিল্যান্ড, নাগপুর ১৯৮৭।

• সবচেয়ে নিখুঁত বোলিং : বেদি ১২-৮-৬-১, বনাম পূর্ব অ্যাফ্রিকা, লীডস্ ১৯৭৫। সবচেয়ে বেশি রান দেওয়া : স্নেডেন ১২-১-১০৫-২, বনাম ইংল্যান্ড, ওভাল ১৯৮৩।

• সেরা অলরাউন্ডার : ইমরান (৬৬৬ রান ও ৩৪ উইকেট), কপিল (৬৬৯ রান ও ২৮ উইকেট)। শুধু এই দু'জনই ৫০০ রান করেও ২৫ উইকেট নিয়েছেন!

• একম্যাচে সেরা অল-রাউন্ড পারফরম্যান্স : জিম্বাবোয়ের ডানকান ফ্লেচার (৬৯* ও ৪-৪২) বনাম অস্ট্রেলিয়া, নটিংহাম ১৯৮৩। ওই একবারই একই ম্যাচে কেউ ৫০ রান ও ৪ উইকেট পেয়েছেন।

• এ-পর্যন্ত বিশ্বকাপে সেরা উইকেট-কিপিং : ওয়াসিম বারি (২৩) ॥ ক্যাচ ১৯, স্টাম্প ৪। বারির পরেই আছেন দুঁজো (১৯), মার্শ (১৮), মোরে (১৮), ডেরিক মারে (১৬), ডেভ রিচার্ডসন (১৫)।

• এক বিশ্বকাপ সিরিজে সর্বাধিক খেলোয়াড়কে আউট করেছেন ডেভ রিচার্ডসন (ক্যাচ ১৪, স্টাম্প ১), ১৯৯২।

• একটা ম্যাচে সর্বাধিক খেলোয়াড়কে আউট করেছেন সৈয়দ কিরমানি (৫), বনাম জিম্বাবোয়ে, লিস্টার।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল হিসেবে ম্যাচ জিতেছে শ্রীলঙ্কা (ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালে) আর জিম্বাবোয়ে (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৮৩ সালে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৯২ সালে)।

• এ-পর্যন্ত বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ টোটাল : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৬০-৬ (৫০ ওভারে) বনাম শ্রীলঙ্কা, করাচি ১৯৮৭। সর্বনিম্ন টোটাল : ক্যানাডা ৪৫ (৪০.৩ ওভারে) বনাম ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৭৯।

• সর্বাধিক এগ্রিগেট : ৬২৬। পাকিস্তান ৩৩৮-৫ বনাম শ্রীলঙ্কা ২৮৮-৯, সোয়ানসি ১৯৮৩। সর্বনিম্ন এগ্রিগেট : ৯১। ক্যানাডা ৪৫ বনাম ইংল্যান্ড ৪৬-২, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৭৯।

• পাঁচটা বিশ্বকাপেই খেলেছেন ইমরান ও মিয়াঁদাদ। তাঁদের মোট ম্যাচের সংখ্যা ২১। তার পরেই কপিল (২৬), হেইন্স ও বর্ডার (২৫), রিচার্ডস (২৩)।

• সবচেয়ে বেশি ম্যাচে অধিনায়কও ইমরান (২২)। তাঁর পরে আছেন লয়েড (১৮), বর্ডার (১৬), কপিল (১৫)।

• মোট সর্বাধিক রান করেছেন জাভেদ মিয়াঁদাদ (১০২৯)। ১০০০ রানের বেশি করেছেন কেবল জাভেদ আর রিচার্ডস (১০১৩)। তাঁদের পরে আছেন গুচ (৮৯৭), মার্টিন ক্রো (৮৯০), হেইন্স (৮৫৪), বুন (৮১৫)।

• মোট সেঞ্চুরির সংখ্যা ৩৪। তিনটে করে সেঞ্চুরি করেছেন রিচার্ডস ও রামিজ রাজা। দুটো করে সেঞ্চুরি করেছেন গ্রীনিজ, মার্শ ও বুন।

• সর্বোচ্চ রান : রিচার্ডস ১৮১, বনাম শ্রীলঙ্কা, করাচি ১৯৮৭। কপিল ১৭৫*, বনাম জিম্বাবোয়ে, টানব্রিজ ওয়েলস ১৯৮৩। টার্নার ১৭১* বনাম পূর্ব অ্যাফ্রিকা, ১৯৭৫।

• গোটা ইনিংসে অপরাজিত থেকেছেন : টার্নার (১৭১*) বনাম পূর্ব অ্যাফ্রিকা, বার্মিংহাম ১৯৭৫। গাভাসকার (৩৬*) বনাম ইংল্যান্ড, লর্ডস ১৯৭৫। মার্শ (১২৬*) বনাম নিউজিল্যান্ড, চণ্ডিগড় ১৯৮৭। ফ্লাওয়ার (১১৫*) বনাম শ্রীলঙ্কা, নিউ প্লিমাথ ১৯৯২।

• সর্বাধিক অর্ধশতরান : মিয়াঁদাদ, গুচ, মার্টিন ক্রো (৯ বার)।

• এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান : গুচ (৪৭১), ১৯৮৭। ক্রো (৪৫৬), ১৯৯২। বুন (৪৪৭), ১৯৮৭। জাভেদ (৪৩৭), ১৯৯২। মার্শ (৪২৮), ১৯৮৭। কারস্টেন (৪১০), ১৯৯২।

এ-পর্যন্ত বিশ্বকাপের সেরা ফিল্ডার : লয়েড, কপিল হেইন্স। প্রত্যেকেই ১২টা করে ক্যাচ লুফেছেন। তারপরে আছেন বর্ডার (১০), রিচার্ডস ও শ্রীকান্ত (৯)। ল্যাম্ব, বথাম, ক্রো, হুপার, ওয়েসেলস (৮)।

• এক বিশ্বকাপ সিরিজে সেরা ক্যাচিং : ওয়েসেলস (৭), ১৯৯২।

• একটা ম্যাচে সর্বাধিক ক্যাচের রেকর্ড ৩ : লয়েড, বনাম শ্রীলঙ্কা, ১৯৭৫। রীভ, বনাম পাকিস্তান, ১৯৯২। ইজাজ, বনাম অস্ট্রেলিয়া, ১৯৯২। বর্ডার, বনাম জিম্বাবোয়ে, ১৯৯২।

• তিনটে পরিত্যক্ত ম্যাচ ছাড়া প্রতিটা ম্যাচেই 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ভারত-নিউজিল্যান্ড নাগপুর ম্যাচে (১৯৮৭) দু'জন 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' হয়েছেন : চেতন শর্মা ও সুনীল গাভাসকার।

• সবচেয়ে বেশি 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' হয়েছেন রিচার্ডস (৫), গুচ (৫), বুন (৪)।

• এক সিরিজে সর্বাধিক (৩ বার) 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' হয়েছেন রিচার্ডস (১৯৮৩), বুন (১৯৮৭), গুচ (১৯৮৭), ক্রো (১৯৯২)।

• প্রথম আবির্ভাবেই 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' : ফ্লাওয়ার, নিউ প্লিমাথ ১৯৯২।

• পরাজিত দলের হয়ে 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ'-এর সম্মান পেয়েছেন সরফরাজ নওয়াজ (বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বার্মিংহাম ১৯৭৫। আব্দুল কাদির (বনাম নিউজিল্যান্ড), নটিংহাম ১৯৮৩। জাহির আব্বাস (বনাম ইংল্যান্ড), লর্ডস ১৯৮৩। ডেভিড হাউটন (বনাম অস্ট্রেলিয়া), সাউদাম্পটন ১৯৮৩। ডেভিড হাউটন (বনাম নিউজিল্যান্ড), হায়দ্রাবাদ ১৯৮৭। অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (বনাম নিউজিল্যান্ড), নিউ প্লিমাথ ১৯৯২।

• বিশ্বকাপের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় জন ট্রাইকস, শেষ ম্যাচ খেলবার সময় তাঁর বয়েস ৪৪ বছর ২৮২ দিন। সর্বকনিষ্ঠ অবশ্যই শচীন তেন্ডুলকার, প্রথম ম্যাচ খেলবার সময় বয়েস ১৮ বছর ৩০২ দিন!

• কেপলার ওয়েসেলসই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি দুটো দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়া (১৯৮৩), দক্ষিণ অ্যাফ্রিকা (১৯৯২)।

(পরের মাসে বাকিটা)

'এই ছোট্ট বইটি যেন সোনায় সোহাগা। একদিকে গল্প, অন্যদিকে ছবি। এ যেন এক যুগলবন্দী।'
প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

'যে-সব বই কথা কয়,
মনের সাথে লেগে রয়,
এই বইটাও তাই।'
লীলা মজুমদার

পাবে এইখানে :
সন্দেশ কার্যালয়
১৭২/৩ রাসবিহারী
অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০০২৯
নিউ স্ক্রিপ্ট
এ-১৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলকাতা ৭০০০০৭
স্বপনতরী
বি১৭/৫৪বি তিলভাণ্ডেশ্বর
বারাণসী ২১১০০১

UNMATCHED QUALITY
REASONABLE PRICE

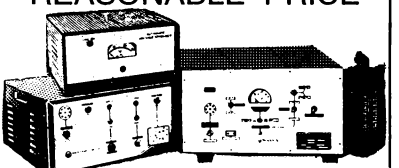

SEN & PANDIT

Stabilizers ● Inverters
Sophisticated Technology
Incomparable Value
Sen & Pandit Electronics Pvt. Ltd.
16B Lake View Road Calcutta 700026
Phone : 466-2622/4026

যে-কোনও মাস থেকে 'সন্দেশ'-এর বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা :
সব সংখ্যা হাতে ১০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যা হাতে, বাকি-সব সাধারণ ডাকে ১১০ টাকা।
বিশেষ সংখ্যা রেজিস্ট্রি-ডাকে, বাদবাকি সাধারণ ডাকে ১৪৫ টাকা।
সব ক'টা সংখ্যা রেজিস্ট্রি-ডাকে ২০০ টাকা। বিদেশে বিমান-ডাকে ৩০ ডলার।

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরিজি মাসের প্রথমে 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয় এবং ডাকে পাঠান হয়।

ইংরিজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও গ্রাহকরা পত্রিকা না-পেলে লিখিত নালিশ জানালে, ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।

সন্দেশ-এর চাঁদা মানি-অর্ডারে, চেক অথবা ড্রাফ্‌ট-এ পাঠান যায়। **Sandesh** নামে চেক লিখবেন। মফঃস্বলের চেক ও পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হয় না।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, প্রতিযোগিতা ও ধাঁধার উত্তর, নিজেদের লেখা ও ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম-ঠিকানা ও বয়েস স্পষ্ট করে লিখবে। 'সন্দেশ' পাঠাবার সময়ে নামের বাঁ-পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র বা মেম্বারই গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে, জোড়া পোস্টকার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দিলে, ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটসহ খাম না-দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোন্ মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না-জানালে, ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না। ১৪০৩/১৯৯৬ সালের শারদীয়া সংখ্যার জন্য লেখা ৩১ মার্চের মধ্যে জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করে ছয় সপ্তাহ আগে আর্ট-ওয়ার্ক বা পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন।
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি : বুলা বর্ধন, আনন্দ ঘোষ।

সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯। ফোন ৪৬৬-৪৯১৯
নিউ স্ক্রিপ্ট-এর দোকান : এ-১৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭

বামনদাস ভট্টাচার্য পাতিরাম বুক স্টল কলেজ স্ট্রিট জংশন, কলকাতা	রবীন বর্মন টাইম্‌স অব্ ইন্ডিয়া ও হাওড়া এলাকায়	প্রশান্ত নন্দী গড়িয়াহাট বিপণি গড়িয়াহাট মোড়, কলকাতা	অবনী দেয়াসী হাজরা মোড়, কলকাতা
শ্যামল ভট্টাচার্য ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড (টেমার লেনের মুখে) কলকাতা ৯	বাবলু পাত্র পাত্র বুক স্টল কলকাতা ৯	সুশীল দত্ত শ্যামবাজার, কলকাতা	প্রদীপ রায় শিয়ালদহ, কলকাতা
দেব স্টোর আগরতলা, ত্রিপুরা	বাদলচন্দ্র নাগ পুরুলিয়া	ইন্টারন্যাশানাল বুক সেন্টার, নিউ দিল্লি ১৯	সন্তোষ সরকার সিউড়ি, বীরভূম
সনৎ ভৌমিক কুলাইবাজার, উত্তর ত্রিপুরা	কিতাব ঘর নিউ দিল্লি ১	খেয়া, পাণ্ডাপাড়া জলপাইগুড়ি	সরস্বতী বুক ডিপো নিউ দিল্লি ১
রায়মঙ্গল প্রযত্নে, আশীর্বাদ প্রকাশনী ৫৭সি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭৩	জোনাকি পুঁথিঘর ডিব্রুগড়, আসাম	ন্যাশানাল বুক এজেন্সি কলকাতা ৭৩	হুইলার বুক-স্টল : বিভিন্ন রেল-স্টেশনে